নবী নন্দিনী

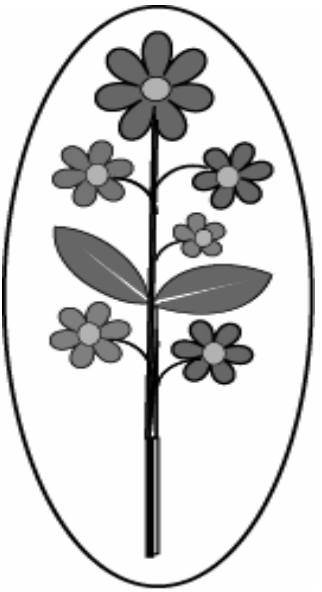

নবী নন্দিনী

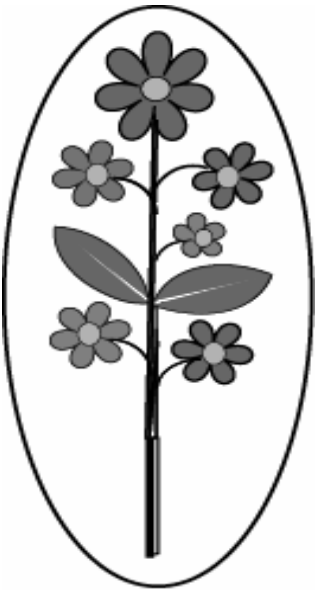

আব্দুল ওয়াহাব খান

নবী নন্দিনী
রচনাঃ আব্দুল ওয়াহাব খান

প্রকাশকঃ
হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া
ভুঁইগড়, নারায়ণগঞ্জ।

প্রচ্ছদঃ
আব্দুর রোউফ সরকার

১ম প্রকাশঃ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬ ইং
৭ম প্রকাশঃ জুলাই ২০০৮ ইং

মুদ্রণঃ
শওকত প্রিন্টার্স
১৯০/বি, ফকিরেরপুল, ঢাকা-১০০০।
মোবাঃ ০১৭১১-২৬৪৮৮৭, ০১৭১৫-৩০২৭৩১

বিনিময় ঃ পঞ্চাশ টাকা

NABI NANDINEE, a life sketch of Hazrat Fatema Johora (Ra) writen by Abdul Wahab Khan in Bengalee and Published by Hakimabad Khanka-e-Mozaddedia.

Exchange : Taka 50.00 U.S.$ 7.00

ISBN 984-70240-0036-1

এখান থেকেই তৈরী হ'য়ে যেতে হবে। সময় কখন শেষ হয় কে জানে। জন্ম মৃত্যুর মাঝখানে সামান্য জীবন। এ অনিশ্চিত জীবনের কোন্ মুহূর্তটি মূল্যবান নয়? অথচ প্রবৃত্তির অপরিণামদর্শী চিন্তাচেতনা আর শয়তানের সুকৌশলী ষড়যন্ত্রের ফাঁদে বন্দী আমরা কী নিশ্চিন্তে ক্ষয় করে চলেছি সময়, জীবন।

আমাদের চেতনায় চলেছে শীতের পাতাঝরা মওসুম। বিশ্বাসের বসন্ত কই? সেই কবে থেকে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে মানবতা। এ স্থবিরতার বাঁধ ভেঙ্গে বিজয়ের চিরন্তন পতাকা চিরউন্নত রাখতে হ'লে সমস্ত মানব সম্প্রদায়কে অবশ্যই মেনে নিতে হবে মহানবী মোহাম্মদ স. এর জীবনাদর্শকে। এ জীবনাদর্শ পূর্ণ, পরিণত, নির্ভুল। এ জীবনাদর্শ বিপ্লবাত্মক শক্তিতে ভরপুর। স্খলন, পতন এবং পরাজয় রোধ করতে হ'লে সমস্ত মানব সম্প্রদায়কে সমস্বরে উচ্চারণ করতেই হবে, 'আখেরাতের কল্যাণ ছাড়া কল্যাণ নাই।'

শেষ নবী স. জীবনপাত ক'রে মানুষের জন্য অবশ্য অনুকরণীয় যে জামাতকে সত্যের মাপকাঠিরূপে গঠন করেছিলেন, তাঁরাই সম্মানিত সাহাবাবৃন্দ। তাঁদেরকে যাঁরা সত্যের মাপকাঠি হিসাবে জানেন এবং মানেন তাঁরাই হেদায়েতপ্রাপ্ত। আর তাদের দোষত্রুটি বর্ণনাকারীরা অভিশপ্ত। এই অভিশপ্ত ব্যক্তিদের জামাত যে খারেজী, রাফেজী এবং মওদুদী- সে কথাও আমাদের স্মরণ রাখতে হবে। তাদেরকে চিহ্নিত করা এবং প্রতিহত করার কাজটি যে আমাদের ঈমানী দায়িত্ব, সে কথা আমাদের ভুলে গেলে চলবে না।

সাহাবাগণের জামাত যেমন হেদায়েতের নক্ষত্রতুল্য, রসুলে পাক স. এর আহলে বায়াত (বংশধর গণও) তেমনি হজরত নুহ আ. এর কিশ্‌তী সদৃশ। এই কিশ্‌তীতে আরোহনকারীরা নিরাপদ। তাই তাঁদের প্রতি মহব্বত ঈমানের অঙ্গ বলে বিবেচিত হ'য়েছে।

সুতরাং আমাদের ঈমানকে সঞ্জীবিত রাখতে হ'লে, আহলে বায়াতের কেন্দ্রবিন্দু হজরত ফাতেমা রা.এর প্রসঙ্গ আলোচিত হওয়া জরুরী। সে উদ্দেশ্যেই নিবেদিত 'নবী নন্দিনীর' সপ্তম সংস্করণের প্রাক্কালে আমরা আমাদের প্রতিপালকের পবিত্রতা এবং প্রশংসা বর্ণনা করছি। সোব্‌হানাল্লহি ওয়া বিহাম্‌দিহি সোব্‌হানাল্লহিল আজীম। সকল প্রকার উৎকৃষ্ট দরূদ এবং সালাম বর্ষিত হোক মহানবী মোহাম্মদ স., তাঁর সম্মানিত সহচরবৃন্দ এবং পবিত্র পরিবার পরিজন ও বংশধরগনের প্রতি। আমিন।

আহবান নারী সমাজের প্রতি। নবী নন্দিনীর আয়নায় নিজেদের চেহারাটা একটিবার মাত্র ভালো করে দেখে নিন না। কে জানে, দয়াময় আল্লাহ্‌তায়ালা হয়তো এতোটুকু আমলের অসিলাতেই দেশনেত্রী হাবার খায়েশ অথবা নারীস্বাধীনতার বিকৃত চিন্তা এবং লজ্জাহীনতা ও পর্দাহীনতার আজাব থেকে মুক্তির পথ হয়তো দেখাতেও পারেন। প্রত্যাবর্তনের পথ তো উন্মুক্তই। ফিরে আসুন।

অন্তর অন্ধকার আমাদের। তাই আমরা দিশাহারা। অন্তরের আঁধার দূর করতে হলে আমাদেরকে প্রজ্জ্বলিত চেরাগ অনুসন্ধান করতেই হবে। আল্লাহ্‌ প্রেমের প্রজ্জ্বলিত চেরাগ যাদের বুকে সারাক্ষণ জ্বলে, তাঁরাই মানবতার নির্ভুল দিশারী-নবী ও রসুল। আখেরী নবী স. এর ইন্তেকালের পর এ দায়িত্ব এসে পড়েছে খাঁটি নায়েবে নবী স. গণের উপর। তাঁরাই বিভিন্ন তরিকায় পীর মাশায়েখ হিসাবে পরিচিত।

আমরা সেরকমই এক সত্য সহজ ও যুগোপযোগী তরিকা– তরিকায়ে খাস মোজাদ্দেদিয়া গ্রহণের জন্য দাওয়াত দিয়ে আসছি বার বার। এবারও দিচ্ছি। আল্লাহ্‌ অন্বেষণকারীগণকে আহবান। উদাত্ত আহবান।

ওয়াস্‌সালাম।

মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ
হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া
ভুঁইগড়, নারায়ণগঞ্জ।

আমাদের বই

- তাফ্সীরে মাযহারী (১–১২) মোট ১২ খণ্ড।
- মাদারেজুন্ নবুওয়াত (১-৮) মোট ৮ খণ্ড
- মুকাশিফাতে আয়নিয়া
- মাআরিফে লাদুন্নিয়া
- মাব্দা ওয়া মা'আদ
- মকতুবাতে মাসুমীয়া (১-৩) মোট ৩ খণ্ড
- নকশায়ে নকশ্বন্দ
- বায়ানুল বাকী
- জীলান সূর্যের হাতছানি
- নূরে সেরহিন্দ
- কালিয়ারের কুতুব
- প্রথম পরিবার
- মহাপ্রেমিক মুসা
- তুমিতো মোর্শেদ মহান
- চেরাগে চিশ্তী
- পিতা ইব্রাহীম
- আবার আসবেন তিনি
- সুন্দর ইতিবৃত্ত
- ফোরাতের তীর
- মহাপ্লাবনের কাহিনী
- দুজন বাদশাহ্ যাঁরা নবী ছিলেন
- কী হয়েছিলো অবাধ্যদের
- THE PATH
- পথ পরিচিতি
- নামাজের নিয়ম
- রমজান মাস
- ইসলামী বিশ্বাস
- BASICS IN ISLAM
- মালাবুদ্দা মিনহু
- সোনার শিকল
- বিশ্বাসের বৃষ্টিচিহ্ন
- সীমান্তপ্রহরী সব সরে যাও
- তৃষিত তিথির অতিথি
- ভেঙে পড়ে বাতাসের সিঁড়ি
- নীড়ে তার নীল ঢেউ
- ধীর সুর বিলম্বিত ব্যথা

ইয়া আল্লাহ্ আমাদিগকে হেদায়েত
করার পর আমাদের অন্তকরণ
(সত্য পথ হইতে) বিমুখ
করিও না এবং তোমার
নিকট হইতে রহমত
প্রদান কর– নিশ্চই
তুমি বিনা পরি-
বর্তে প্রচুর
প্র দা ন-
কারী।

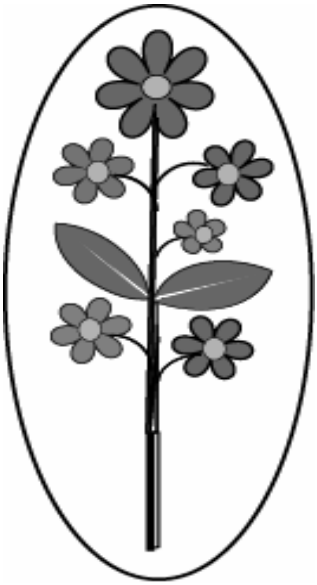

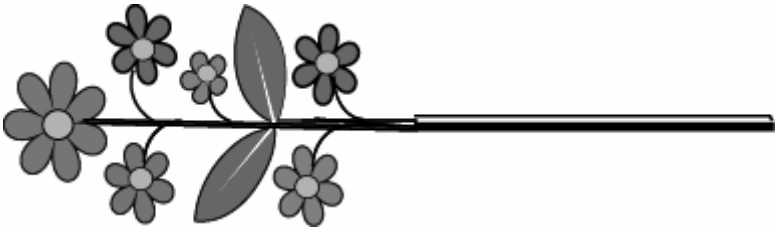

সে রাতে মরুতে সাইমুম উঠেনি। আসমানে ছিলো পূর্ণ চাঁদ। একটি তারা আড়াল করবার মতো একখণ্ড ধুসর মেঘও ছিলো না আসমানে। বাতাসে সুমিষ্ট আমেজ। ভোরের পাখ-পাখালীর কাকলী-কুজন আর মোরগের উদাত্ত কণ্ঠের জাগরণী আহবানে ছিলো মরুচারী বেদুইন-প্রাঙ্গণ সংগীতময়। লু আর সাইমুমের মরুভূমিতে আজ এ কোন বিস্ময়!

মা খাদিজা রা. প্রসব বেদনায় অস্থির। অসহায় মুহূর্ত। প্রতিবেশী রমণীদের খবর দেয়া হলো। কিন্তু সাড়া দিলো না কেউ। একি ঈর্ষা না প্রতিহিংসা?

যৌবনে মা খাদিজাকে পর পর দুবার বৈধব্যের তিক্ত স্বাদ গ্রহণ করতে হয়েছিলো। কোনো স্বামীই তাঁর বেশীদিন জীবিত ছিলেন না। তাই তিনি জীবনে আর বিবাহ করবেন না বলেই স্থির করেছিলেন। কিন্তু নূরনবী হজরত মোহাম্মদ স.-এর সততা এবং চরিত্র মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন তিনি এবং নিজে উপযাচক হয়েই রসুলেপাক স.কে বিবাহ করেন।

মা খাদিজা ছিলেন অত্যন্ত সুন্দরী। জ্ঞান-গরিমায় মহিয়ষী। স্বভাব-চরিত্রে অনন্যা। সম্ভ্রান্ত কোরাইশ বংশের কোশাই কাবিলায় তাঁর জন্ম। পিতা খোয়াইলিদ ছিলেন ধনী ব্যবসায়ী। তিনি ছিলেন পিতার একমাত্র উত্তরাধিকারিণী। এসব কারণেই অনেক সম্ভ্রান্ত ঘরের পাত্র তাঁর প্রতি আকৃষ্ট ছিলো। অনেকেই বৈধব্যকালীন সময়ে বিবাহের প্রস্তাব পাঠান। মা খাদিজা এসব প্রস্তাবে সাড়া দেননি। কাজেই তাঁরা হজরত খাদিজার রা. প্রতি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ছিলেন। মোহাম্মদ স.-এর মতো কপর্দকহীন যুবককে উপযাচক হয়ে বিবাহ করায় তাঁরা আরো ক্ষেপে যান এবং তাঁকে একঘরে অবস্থায় রাখেন। কিন্তু মা খাদিজা সমাজপতিদের সে

উপেক্ষার পরোয়া করেননি। কারণ, তিনি রসুলেপাক স.-এর মধ্যে যে অমূল্য সম্পদের মজুদ দেখেছিলেন, সে গুপ্ত সম্পদের কাছে পার্থিব জগতের ঐশ্বর্য অত্যন্ত তুচ্ছ। নিতান্তই মূল্যহীন। তাই তিনি পাড়া-পড়শীর অসহযোগিতায় ধৈর্য হারালেন না। সেই পরম করুণাময় বিশ্ব-নিয়ন্তার সাহায্যই তিনি কামনা করলেন।

আল্লাহ্ যার সহায়, তিনি যাকে নিয়ামত দান করেন– ক্ষুদ্র-জ্ঞান মানুষের সাধ্য কি তার বিরোধিতা করে?

প্রসব বেদনায় কাতর জননী। ছটফট করছেন। হঠাৎ সব ব্যথার অবসান হলো। শীতল শান্তিতে মোহময় হয়ে উঠলো শরীর। তিনি যেনো স্বপ্ন দেখছেন। এক নূরানী আলোয় ঝলমলিয়ে উঠলো কুটির। বেহেশতি পুণ্যাত্মা রমণীগণের উপস্থিতিতে মনোরম হয়ে উঠলো পরিবেশ। প্রসূতিকে নিয়ে ব্যস্ত সবাই। স্রষ্টার কি অপার মহিমা! কখন, কেমন করে কি হলো, কোথায় গেলো ব্যথা-বেদনা বুঝতেই পারলেন না তিনি। চোখ মেলতেই দেখলেন, বক্ষ-পাশে হাত-পা নেড়ে খেলা করছে ফুটফুটে ছোট্ট শিশুটি। সমস্ত ঘর-জুড়ে এক অপূর্ব নূরানী বিচ্ছুরণ। বেহেশতি অম্বরের সুমিষ্ট গন্ধ ছড়িয়ে আছে আনাচে কানাচে।

আল্লাহ্র প্রিয় বান্দা– যাঁরা দুনিয়ার বুকে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন, তাঁদের জন্মকালীন সময়ে কিছু কিছু অলৌকিক শুভ আলামত পরিলক্ষিত হয়। হজরত ফাতেমা জোহরার রা. জন্মের সময়েও মা খাদিজা রা. গর্ভস্থ সন্তানের সুলক্ষণের ইঙ্গিত পান। স্বপ্নের মধ্যে দেখেন, ফেরেশতারা নিয়ে আসেন বেহেশতি মেওয়া। সারাক্ষণ সমস্ত চেতনাকে বিমোহিত করে রাখে সুমিষ্ট সুবাস। মনের মণি কোঠায় এক অজানা শিহরণ বয়ে যায় ফল্গুধারার মতো।

ঐ বৎসরেই কাবা ঘরের মেরামতের কাজ সুসম্পন্ন হয়। আল্লাহ্র ঘর কাবা। একদিকে তার জরাজীর্ণ অবস্থা, অপরদিকে সেখানে আল্লাহ্র একত্বের পরিবর্তে পৌত্তলিকতা আর ভূত-প্রেতের আশ্রয়স্থলে পরিণত হয়েছে। সেই কাবা ঘর থেকে ভূত-প্রেত আর পৌত্তলিকতা চিরবিদায় নিবে, সেখানে তাঁর একক্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে এটাই তো আল্লাহ্র ইচ্ছা। তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার ক্ষমতা কারোরই নেই। যে ঘরকে কেন্দ্র করে প্রিয় নবী স. সেই বিশ্বস্রষ্টার শ্রেষ্ঠত্বের মহিমা প্রতিষ্ঠিত করবেন, সে ঘর এমন জরাজীর্ণ অবস্থায় থাকতে পারে না। তাই আল্লাহ্ তাঁর হাবিবকে নবুয়তী প্রদানের পাঁচ বছর আগেই কাবা শরীফ মেরামতের কাজ সম্পন্ন করেছিলেন। আর ফাতেমা রা. এর জন্মের বছরই তা সম্পন্ন হয়েছিলো। এ জন্যই এ বছরকে শুভ বছর হিসাবে ধরা হয়। যদিও তাঁর জন্ম তারিখ সম্পর্কে অনেক মতভেদ আছে। তবে অধিকাংশের মত অনুযায়ী কাবা শরীফের সংস্কারের বৎসরেই হজরত ফাতেমা রা. জন্মগ্রহণ করেন।

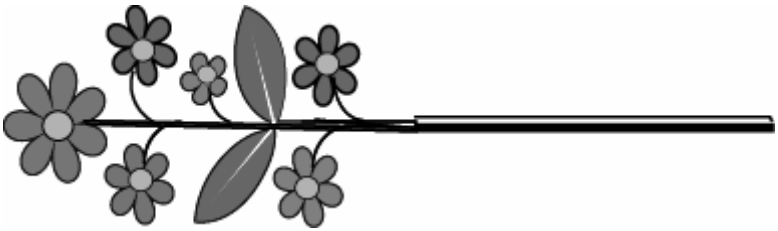

কন্যার জন্মের কিছুক্ষণ পরে পিতা নূর নবী স. সূতিকাগৃহে প্রবেশ করে কন্যাকে কোলে তুলে নিলেন। আদর করলেন। চুমু খেলেন। নাম রাখলেন ফাতেমা। দোয়া করলেন– নারী জগতের শিরোমনি হও তুমি মা। আখেরাতেও আল্লাহ্ তোমাকে নারীদের সম্রাজ্ঞী বানাবেন।

ফাতেমা! কি মাধুর্যমণ্ডিত নাম! নামের মাধ্যমেই যেনো তাঁর মানবীয় গুণাবলীর সমন্বয় ঘটেছে। এ নাম শুনলে এমনিতেই শ্রদ্ধায় মাথা অবনত হয়ে আসে। নামের সঙ্গে জীবনের বাস্তবতার এতো অদ্ভুত মিল কখনো দেখা যায় না। একবার হজরত আলী রা. রসুলেপাক স.কে জিজ্ঞেস করলেন– হে আল্লাহ্র রসুল, আপনি কেনো তাঁর নাম ফাতেমা রাখলেন?

রসুলেপাক স. বললেন– তাঁর নাম ফাতেমা এই জন্য রেখেছি যে, আল্লাহ্ তাঁকে এবং তাঁর সন্তানদেরকে দোজখের আগুন থেকে হেফাজত করবেন।

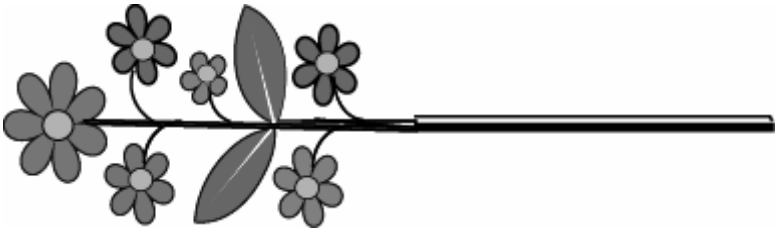

মায়ের কোলে, পিতৃস্নেহে দিন দিন বেড়ে উঠেন ফাতেমা। নূরানী চেহারায় যেনো বিদ্যুৎ চমকায়। ফুলের পাঁপড়ির মতো বিকশিত হয় অবয়ব। কেউ বলে মাটির পৃথিবীতে আকাশের চাঁদ। শান্ত কোমল মুখাবয়বে মরুদ্যানের প্রশান্তি মাখানো। কান্না নেই। চপলতা-চঞ্চলতা নেই। সবাই আদর করে। সস্নেহে কোলে তুলে নেয়।

বাল্যকালটা মানব জীবনের এক মধুর অধ্যায়। দুশ্চিন্তাহীন দুরন্ত জীবন। ধূলোমাটি আর পুতুলের সাথে যার সম্পর্ক; হৈ-চৈ,আর গল্প-গুজব করে সময়

কাটানো, কিংবা বন-বাদাড় ঘুরে ঘুরে প্রজাপতি ধরার আনন্দময় সময়টা নিশ্চয়ই মধুর। কিন্তু হজরত ফাতেমার এ সময়টা ছিলো সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত। সমবয়সী আপন জ্যেষ্ঠা ভগ্নিদের সঙ্গেও কখনো খেলা কিংবা বাদানুবাদ মারামারিতে লিপ্ত হতে দেখা যায়নি তাঁকে। কখনো মিথ্যা বলেছেন এমন নজিরও পাওয়া যায় না। বাল্যকাল থেকেই তিনি ছিলেন এক অনন্য প্রতিভার অধিকারিণী। তাঁর চিন্তা-চেতনার মধ্যে কখনো বালিকাসুলভ আচরণ লক্ষ্য করা যায়নি। ধীরস্থির প্রকৃতির ও নম্র স্বভাবের এ মেয়েটির মধ্যে চপলতা, কৌতুক, অহমিকার লেশমাত্র ছিলো না। অধিকতর নির্জনতাই তিনি বেশী পছন্দ করতেন। তাঁর এই অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিভিন্নমুখী গুণাবলী লক্ষ্য করেই রসুলেপাক স. মন্তব্য করেছিলেন– ফাতেমা ভবিষ্যত জীবনে অক্ষয় যশের অধিকারী হবে। পিতার এ ভবিষ্যত বাণী সম্পূর্ণ সত্য বলেই প্রমাণিত হয়েছে।

হজরত ফাতেমা রা.-এর ভিতরে বাল্যকালেই একজন পরিপূর্ণ মানুষের হৃদয়বৃত্তির বিকাশ ঘটেছিলো। তাঁর প্রতিটি কাজে, কথায় এক নিপুণ সৌন্দর্যের স্পর্শ অনুভূত হতো। ভিতরটা ফুলের মতো কোমল সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ। বাইরের রূপও অসাধারণ। মহানবী স. বলেছেন– মহান আল্লাহ্ মাত্র দুজন মহিলাকে অপরূপ সুন্দরীরূপে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। একজন মানব জাতির আদি মাতা মা হাওয়া। অপরজন ফাতেমা। আপন মহিমায় আল্লাহ্তায়ালা এ দুজনকে সৃষ্টি করেছেন। এমন অপরূপ সুন্দরীরূপে দুনিয়ায় তৃতীয় কেহ আসেনি, আসবে না। এই রূপ আর গুণের একত্র সমাবেশ ঘটার কারণেই বিশ্বস্রষ্টা দুনিয়া এবং আখেরাতে হজরত ফাতেমাকে স্ত্রী জাতির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।

ছোটবেলা থেকেই তাঁর চিন্তা-চেতনার বিষয়বস্তু ছিলো আলাদা। পুতুল খেলা ছেড়ে পিতা মাতার জ্ঞানগর্ভ আলোচনা মনোযোগ সহকারে শোনেন তিনি। মাঝে মাঝে নিজেও আলোচনায় যোগ দেন। জ্ঞান সাগরে ডুব-সাঁতার কাটেন। এজন্য পিতা-মাতাও অত্যধিক স্নেহ করেন তাঁকে।

সবাই বলেন ফাতেমা বৃদ্ধ হয়ে গেছে। প্রিয় নবী স. আবেগে উদ্বেল হয়ে উঠেন। বলেন– তোমরা তাকে চিনতে পারোনি। নিতান্ত অজ্ঞ বলেই এমন কথা বলছো। সে আমার মায়ের আসনে সমাসীনা। গর্বিত পিতার এ পবিত্র উক্তির মধ্যে যে কতোখানি সত্য নিহিত ছিলো তা হজরত খাদিজা রা.-এর ইন্তেকালের পর রসুলেপাক স. এর মতো অনেকেই উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর জীবনের ব্যথা-বেদনা, দুঃখ-যাতনা হজরত ফাতেমা রা. মাতৃ-হৃদয় দিয়েই অনুভব করেছেন। মায়ের মতোই তিনি স্নেহ মমতায় সিক্ত করে পিতার ব্যথা-বেদনা সবকিছু ভুলিয়ে দিতে সদা সচেষ্ট থাকতেন।

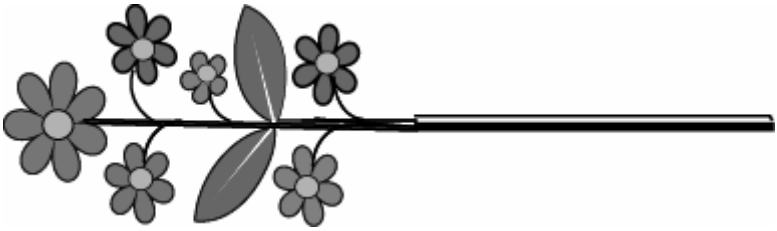

হজরত ফাতেমা তখন পাঁচ বছরের বালিকা মাত্র। নূরনবী স. হেরেম শরীফে নামাজরত। আবু লাহাব কুমতলব আঁটলো। নবী স.কে অপদস্থ করতে হবে। কাফের কমবখত্ উতবাকে প্ররোচিত করলো সে। সেজদায় মাথা নত অবস্থায় দুশ্চরিত্র উতবা উটের নাড়ি-ভূঁড়ি এনে রসুলে করিম স. এর পবিত্র ঘাড়ে এমনভাবে জড়িয়ে দিলো যে, ঘাড় উত্তোলন করা খুবই কষ্টকর হয়ে গেলো মহানবীর স.। নিঃশ্বাস নিতেও খুব কষ্ট হচ্ছিলো। এমন অবস্থায় কেউ তাঁকে সাহায্য করতে এলো না। বরং বদচরিত্র বদমাশরা আনন্দে নৃত্য করতে লাগলো। এ সংবাদ বালিকা ফাতেমার কানে গেলো। তিনি কোমল হৃদয়ে দারুণ আঘাত পেলেন। কাঁদতে কাঁদতে হেরেম শরীফে ছুটে এলেন। তাঁর কচি হাতে অনেক কষ্টে পিতার ঘাড় থেকে উটের পচা নাড়ি-ভূঁড়ি সরিয়ে ফেললেন। কম-বখ্ত কাফেররা দূরে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করলো সব। কিন্তু তখন তাদের আনন্দ-নৃত্য থেমে গেছে। এ হেন জঘন্য মনোবৃত্তি আর নীচতার জন্য হজরত ফাতেমা কোরাইশ দলনেতাদের তিরস্কার করলেন। তারপর কাঁদতে কাঁদতেই পিতার হাত ধরে বাড়িতে চলে গেলেন। হারিয়ে পাওয়া সন্তানকে বুকে নিয়ে মা যেমনটি করে।

আর একদিন প্রিয় নবী স. পথ চলছেন। তাঁকে ঘিরে ধরলো একদল লোক। তারা মহানবীর স. পবিত্র দেহের প্রতি ধূলি নিক্ষেপ করছে, মুখে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করছে। তাঁর সমস্ত দেহ ধূলোয় ধূসর হয়ে গেছে। পাষণ্ড কাফেররা থামছে না তবু। দয়াল নবী স. পাহাড়ের মতো স্থির। আকাশের মতো উদার। কি তাঁর অন্যায়? তিনি তো জুলুম করেননি? তিনি শুধু এক আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে বলছেন মানুষকে। মানুষকে সত্য পথের সন্ধান দিতে চাইছেন তিনি। বিশ্বস্রষ্টার সৃষ্টিকে ভালোবাসতে বলছেন। পরিবর্তে মানুষ করছে তাঁর প্রতি নিষ্ঠুর নির্মম আচরণ।

এমনি সময়ে হজরত ফাতেমা বাইরে এসে ঘটনা প্রত্যক্ষ করলেন। পিতার এ দুরবস্থা দেখে দুঃখে কেঁদে ফেললেন। পাগলের মতো ছুটে গিয়ে পিতাকে জড়িয়ে ধরলেন। কান্না জড়িত কণ্ঠে বালিকা ফাতেমা রা. কাফেরদের ভর্ৎসনা করলেন।

এবার কাফেররা সত্যি লজ্জিত হয়ে মাথা নত করে চলে গেলো। ফাতেমা রা. চোখ মুছতে মুছতে পিতার হাত ধরে গৃহাভ্যন্তরে চলে গেলেন। তারপর মায়ের মতোই পিতার শরীরের সমস্ত ধূলো-বালি ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দিলেন।

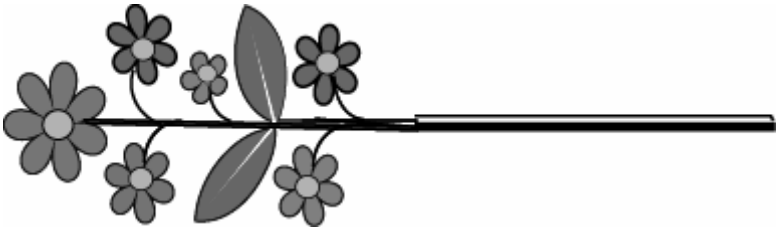

মোহাম্মদ স.কে হেরেম শরীফে নামাজরত অবস্থায় হত্যার পরিকল্পনা করে কাফেরগণ। এ কথা ফাতেমার রা. কানে গেলো। নিতান্তই বালিকা তিনি। ফুলের মতো পবিত্র মন। পিতার অমঙ্গল চিন্তায় অস্থির হয়ে উঠলেন ফাতেমা রা.। কেঁদে বুক ভাসিয়ে দিলেন। বার বার পিতাকে বারণ করলেন হেরেম শরীফে যেতে। আল্লাহ্‌র নবী মোহাম্মদ স.। আল্লাহ্ তাঁর সহায়। তিনি কি কখনো বে-দ্বীন কাফেরদের হত্যার হুমকিতে ভয় পান। হেসে ফেললেন তিনি। প্রিয়তমা কন্যার মাথায় স্নেহের হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিলেন। বললেন– মা আমার, তুমি অজুর পানি আনো। এখনই আমি নামাজ পড়তে যাবো আল্লাহ্‌র ঘরে। তিনিই আমার জানমালের একমাত্র মালিক। সুতরাং তুমি ভয় করো না। কাফেররা আমার কিছুই করতে পারবে না। এবার ফাতেমা শান্ত হলেন। তাড়াতাড়ি পিতাকে অজুর পানি এনে দিলেন। কিন্তু মায়ের মনের ব্যথা সন্তান কি বোঝে? দুঃখিনী মায়ের হৃদয়ের গভীরে সব সময়ই সন্তানের অমঙ্গল আশংকা ধুক ধুক করে জ্বলতে থাকে।

বিশ্বজগতের বিশালত্ব, সৃষ্টির কুশলী কারিগরি, মানুষের জন্ম-মৃত্যু-জরা এ সব নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করা বালিকা ফাতেমা রা. এর জন্য অদ্ভুত বৈকি। মাকে প্রশ্ন করেন– আম্মাজান, আল্লাহ্‌তায়ালা মানুষ সৃষ্টি করেছেন দয়া-মায়া, স্নেহ-মমতার নিবিড় বন্ধনে। একের খুশীতে আনন্দ পায় অন্যজন। একজনের মৃত্যু হলে অন্যে ব্যথা পায়-কাঁদে। তিনি কি একদিনে সব মানুষ দুনিয়ায় পাঠিয়ে একদিনেই তুলে নিতে পারতেন না? তাহলে সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনা কিছুই থাকতো না।

মা খাদিজা রা. তো বিস্ময়ে বিমূঢ়। এতোটুকু মেয়ে বলে কি? তাঁর চিন্তা শক্তির গভীরতা দেখে মনে মনে আনন্দিতও হন তিনি। ধীরে ধীরে বলেন– তা কি করে হয় মা। আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্টির মধ্যে শৃঙ্খলা রাখতে চান। আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত একটা নিয়মের মধ্যেই চলবে দুনিয়াটা। তবু তো মানুষ কতো উচ্ছৃঙ্খল।

ভুলে যায় এটা তার পরীক্ষার জায়গা। তিনি মানুষকে শ্রেষ্ঠ হিসাবে গড়েছেন। আত্ম-বিশ্লেষণের পথ উন্মুক্ত করেছেন, বিবেক বুদ্ধির চেতনা শক্তি দিয়ে। তাঁর এই শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্যই নানা রকম প্রলোভনের উপকরণ সামনে রেখেছেন। যাঁরা এসব প্রলোভন থেকে মুক্ত থেকে আল্লাহ্‌র আদেশ নিষেধ মেনে চলবেন, তাঁরাই পরকালে পুরস্কৃত হবেন। আর যারা আল্লাহ্‌র নাফরমানী করে বিপথগামী হবে, তারা শাস্তি ভোগ করবে।

আর একদিন হজরত ফাতেমা রা. মাকে জিজ্ঞেস করলেন– আম্মা, আল্লাহ্‌কে আমরা না দেখেই তাঁর প্রতি বিশ্বাস এনেছি। একমাত্র তাঁরই উদ্দেশ্যে আমরা মাথা নত করি। তিনি কি আমাদের কোনো দিনই দেখা দেবেন না?

মা বললেন– অবশ্যই তিনি আমাদের দেখা দেবেন। কিন্তু এ দুনিয়ায় নয়। আমরা যদি তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলি এবং সৎ জীবন যাপন করি ও তাঁর সৃষ্টিকে ভালোবাসতে পারি, তবে মৃত্যুর পরে বেহেশতে গিয়ে তাঁকে আমরা দেখতে পাবো।

এমনি ধরনের নানা প্রশ্ন তাঁর মনে অহরহ অনুরণিত হতো। যতক্ষণ পর্যন্ত তার সন্তোষজনক সমাধান না পেতেন ততক্ষণ মনে স্বস্তি পেতেন না তিনি।

হজরত ফাতেমা জোহরা রা. ছিলেন হজরত খাদিজার রা. সর্বকনিষ্ঠা সন্তান। কন্যার যখন বাল্যাবস্থা, মাতা তখন বার্ধক্যে। নিজের শরীরই যথেষ্ট দুর্বল। মনের মতো করে স্বামীসেবা করতে পারেন না। এ জন্য মনে মনে তিনি ব্যথিত হন। ফাতেমা নিতান্ত বালিকা হলেও মায়ের মনোভাব বুঝতে পারেন। তাই মায়ের ইচ্ছাটুকু পুরোপুরিভাবে পূরণ করতে প্রায় সব সময়েই পিতৃসেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখেন তিনি। অপরদিকে মায়ের সেবা-যত্নেরও কোনো ত্রুটি হয় না। বস্তুতঃ পিতা মাতার খেদমতেই অধিকাংশ সময় ব্যয় করেন ফাতেমা রা.। উল্লেখ্য যে, হজরত ফাতেমা রা. বাল্যকালে নিজেও শারীরিকভাবে একটু দুর্বল প্রকৃতিরই ছিলেন।

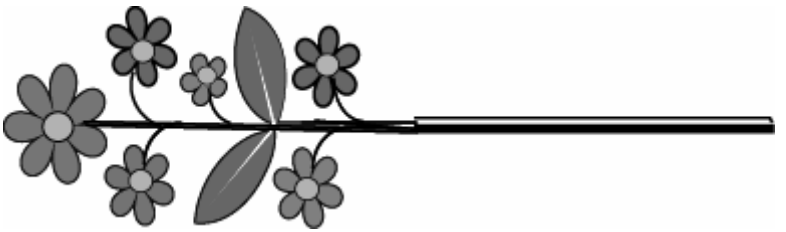

হজরত ফাতেমা রা. এর অক্ষর জ্ঞান সামান্যই ছিলো। তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা অক্ষরজ্ঞানের মাপকাঠিতে মাপা যাবে না। প্রকৃতপক্ষে আক্ষরিক শিক্ষা প্রকৃত

জ্ঞানের মাপকাঠি নয়। মনুষ্যত্ব ও জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। প্রিয় নবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা স. জগতের শ্রেষ্ঠ মানব। অথচ অক্ষর পরিচিতি তাঁর ছিলো না। স্বয়ং আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁর শিক্ষক। সেই ঐশ্বরিক জ্ঞানের ভাণ্ডার নবী স. এবং তাঁর সুযোগ্য সহধর্মিণী হজরত খাদিজা রা. ছিলেন আদরের দুলালী হজরত ফাতেমার রা. শিক্ষাগুরু। সে জন্যই তাঁর শিক্ষার ধরনও ছিলো ভিন্ন প্রকৃতির। মক্তব-মাদ্রাসার ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে তাঁর জ্ঞান আহরণ সীমাবদ্ধ ছিলো না। বাস্তবের প্রেক্ষাপটে জাগতিক ও পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য তাঁর জ্ঞান আহরণের পরিসীমা ছিলো বিভিন্নমুখী। দুনিয়ায় যা তুলনাহীন। এ কারণেই তাঁর জীবনের সকল দিকই ছিলো মহিমান্বিত। একাধারে তিনি ছিলেন– সু-সন্তান, আদর্শ গৃহিনী, স্নেহময়ী জননী ও একজন কল্যাণময়ী নারী। তাঁর কবি প্রতিভাও ছিলো। পিতার ইনতিকালের পর তিনি শোক গাঁথা রচনা করেছিলেন।

সে যুগে আরবে শিক্ষা-দীক্ষার প্রচলন ছিলো খুবই সীমিত। অধিকাংশ লোকই ছিলো অশিক্ষিত বর্বর শ্রেণীর। কঠোর সংগ্রাম করে টিকে থাকতে হতো তাদের। জীবন জীবিকার সন্ধানে যাযাবরের মতো স্থানান্তরে ঘুরে বেড়াতে হতো। পশুপালন আর তস্করবৃত্তিই ছিলে তাদের প্রধান উপজীবিকা। এ কারণে শিক্ষার পরিবেশ গড়ে উঠেনি। স্কুল-মাদ্রাসাও ছিলো না।। তবে অপেক্ষাকৃত ভদ্র কোরাইশ বংশের মধ্যে সামান্য লেখাপড়ার প্রচলন ছিলো। শিক্ষিত শ্রেণী বলতে তাঁদেরকেই বোঝাতো। তাদের মধ্যে অনেক কবিও ছিলেন। কিন্তু হজরত ফাতেমার রা. শিক্ষা ব্যবস্থা ছিলো তুলনাহীন। জগতের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক-শিক্ষিকার কাছে নেয়া পাঠ তাঁর জীবনে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয়েছিলো।

হজরত ফাতেমার রা. জননী হজরত খাদিজা রা. ছিলেন একাধারে সম্পদশালিনী ও সম্ভ্রান্ত ঘরের বিদুষী মহিলা। তা সত্ত্বেও ঘরে কোনো দাসদাসী ছিলো না। সংসারের যাবতীয় কাজ তিনি নিজ হাতেই সম্পাদন করতেন। তিনি ছিলেন বিনয়ী ও নিরহংকারী। দানে উদার হস্ত। নিজের সমস্ত সম্পদ অভাবগ্রস্থদের মাঝে উজাড় করে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। অপরদিকে তিনি ছিলেন পতিপরায়ণা এবং ধর্ম-কর্মে একনিষ্ঠা। এসব বিষয়ের পাঠ তিনি কন্যা ফাতেমাকে অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে শিখিয়েছেন। ফাতেমা রা.ও একজন মেধাবী ছাত্রীর মতো মায়ের চরিত্র মাধুর্যে নিজেকে গড়ে তুলেছেন।

পিতা নূরনবী স. কঠোর বাস্তবতার অভিজ্ঞতায় আমৃত্যু কন্যাকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে গড়ে তুলেছেন। ধৈর্য-সহিষ্ণুতা ছিলো তাঁর জীবনের ধর্ম। কঠোর সংগ্রাম করে এবং অবিচল আত্মবিশ্বাস আর ধৈর্য-সহিষ্ণুতার মাধ্যমে জীবনে সফলতা এনেছেন তিনি। এ অভিজ্ঞতার আলোকেই তিনি আদরের দুলালী হজরত ফাতেমা জোহরা রা.কে পূর্ণরূপে আলোকিত করে তুলেছিলেন।

রসুলেপাক স. ছিলেন অক্ষরের অমুখাপেক্ষী। আক্ষরিক শিক্ষার সুযোগ ও পরিবেশ তাঁর অনুকূল ছিলো না। মাতৃগর্ভে থাকতেই পিতা আবদুল্লাহ ইনতিকাল করেন। মাত্র ছয় বৎসর বয়সে মা আমিনাও তাঁকে এতিম বানিয়ে ইহধাম ত্যাগ করেন। এরপর দাদা আবদুল মুত্তালিব এর তত্ত্বাবধানে বড় হতে থাকলেন হজরত স.। দাদা ছিলেন তৎকালীন আরবের কোরাইশ বংশের সরদার। কাবাঘরের তত্ত্বাবধায়ক পদ বংশানুক্রমে তিনিই লাভ করেছিলেন। কোরাইশ কাবিলার এই শাখাই নবী ইব্রাহিম আ. এর বংশের মূল শাখা। এ কারণেই তিনি ছিলেন তৎকালীন সময়ের খুব প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব। কিন্তু আর্থিক দৈন্যের কারণে নবী মোস্তফার লেখাপড়ার দিকে নজর দিতে পারেননি ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও। তাঁর অন্তর ছিলো কোমল। তাই তিনি শিশু মোহাম্মদ এর সেবা যত্নের ত্রুটি করেননি। আবদুল মুত্তালিব যতোদিন জীবিত ছিলেন ততোদিন নাতি মোহাম্মদকে পিতামাতার অভাব তিনি বুঝতে দেননি। কিন্তু পিতামহের আশ্রয়ও তাঁর ভাগ্যে বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। নাবালক পিতৃ-মাতৃহীন এতিম নাতিটিকে পুত্র আবু তালিবের হাতে তুলে দিয়ে মুত্তালিব দুনিয়া থেকে চলে যান। পিতৃব্য আবু তালিব ছিলেন অত্যন্ত গরীব। আর্থিক অনটনের জন্যই বালক মোহাম্মদের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করতে পারেননি তিনিও। কিন্তু তিনি তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। শত অভাব অনটনের মধ্যেও বালক মোহাম্মদের শরীরে কাঁটার আঁচড় লাগতে দেননি। ইসলামের প্রাথমিক সংকটময় মুহূর্তে তাঁকে ছায়ার মতো আগলে রেখেছেন। তিনি যতোদিন জীবিত ছিলেন ততোদিন ইসলামের শত্রুরা হজরত মোহাম্মদ স. এর বিরুদ্ধে চরম কোনো সিদ্ধান্ত নিতে সাহস করেনি।

বিশ্ব স্রষ্টা রাব্বুল আলামীনের কি অপূর্ব মহিমা। তিনি তাঁর পেয়ারা হাবিবকে মাতৃগর্ভ থেকে আপন ইচ্ছায় গড়ে তুলেছেন। একাধারে তিনি ছিলেন এতিম, গরীব, মেষ পালক, কৃষক, ব্যবসায়ী, অক্ষরের অমুখাপেক্ষী, রাষ্ট্র প্রধান এবং মানুষের মুক্তির দিশারী। জীবনের প্রতিটি স্তরে কঠিন সংগ্রামের মাধ্যমে ধীরে ধীরে সাফল্যের চরম শিখরে উঠেছেন তিনি। এই সাফল্যের পিছনে ছিলো তাঁর সাধনা, নির্লোভ অন্তঃকরণ, ধৈর্য, সহিষ্ণুতা এবং এক আল্লাহ্‌র প্রতি অবিচল নিষ্ঠা। নিজ অভিজ্ঞতার আলোকে এসব বিষয়ে রসুলেপাক স. প্রাণ-প্রতিম কন্যাকে আজীবন দীক্ষা দিয়েছেন। হজরত ফাতেমার প্রতিটি কাজে, কথায়, আচার-আচরণে সস্নেহ নজর রাখতেন মহানবী স.।

রসুলে আকরাম স. একবার যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে এসেই ফাতেমাকে দেখতে যান। যুদ্ধজয়ী পিতাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য কন্যা কুটিরের দেয়ালে পর্দা ঝুলিয়েছিলেন এবং দুই শিশুপুত্র হাসান-হোসেনের হাতে পরিয়েছিলেন রূপোর বালা। ফাতেমার এহেন পরিবর্তন দেখে তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হন এবং তৎক্ষণাৎ

ফিরে যান। পিতাকে এমনিভাবে চলে যেতে দেখে ফাতেমা কেঁদে আকুল। কি কারণে পিতা আজ তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। নবীজীর ভৃত্য আবু রাফের কাছে প্রকৃত ঘটনা জেনে সাথে সাথেই বালা আর চাদর খুলে পিতার কাছে পাঠিয়ে দিলেন ফাতেমা। দুই পুত্রের হাত ধরে কাঁদতে কাঁদতে পিতার কাছে চলে গেলেন। নবীজী বালা আর চাদর তখনই বিক্রয় করে দিলেন এবং প্রাপ্ত অর্থ গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়ে তবে প্রিয়তমা কন্যার কাছে এলেন। সস্নেহে ডেকে বললেন– ফাতেমা, ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার অর্থ সম্পদের প্রতি মোহ নবী-কন্যাদের শোভা পায় না। পার্থিব সম্পদের মোহে আখেরাতকে কুহেলিকার আবরণে ঢেকে দিও না।

নবীকন্যা বলে তাঁর মনে কখনো আত্মঅহমিকা যেনো না আসে এজন্য তিনি প্রায়ই বলতেন– হে নবীকন্যা ফাতেমা, কাল কেয়ামতে আল্লাহ্‌র রোষানল থেকে তোমাকে আমি রক্ষা করতে পারবো না, যদি না তুমি নিজের পাথেয় নিজেই সংগ্রহ করতে পারো।

ধর্ম-ভীরুতা, আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকে ভালোবাসা, সত্য ভাষণ, দুস্থকে সাহায্য, স্বামী-সেবা, বিপদে ধৈর্যাবলম্বন, লজ্জাশীলতা, অতিথি পরায়ণতা প্রভৃতি ছিলো ফাতেমা চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। নবী করিম স. জীবনের প্রতিটি স্তরে এসব শিক্ষা দিয়ে প্রাণপ্রিয় কন্যাকে বিশ্বের এক বরণীয় রমণী হিসাবে গড়ে তুলেছিলেন। নবী স. এর এ শিক্ষা ফাতেমার রা. জীবনের সর্বক্ষেত্রে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয়েছে। তাইতো তাঁকে বলা হয় খাতুনে জান্নাত।

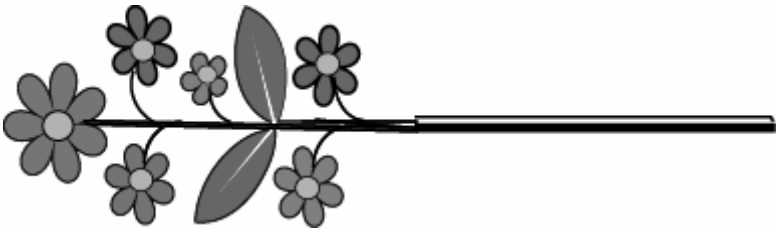

সন্তানের সর্বোত্তম নির্ভরযোগ্য আশ্রয়স্থল হলো তার মা। সন্তান তার কামনা-বাসনা, সুখ-দুঃখ সব কিছুতেই মায়ের কাছে যেমন অকপট, তেমনি মা-ও সন্তানের হাসি-আনন্দে, বিরহ-বেদনায় নিজেকে সারাজীবন জড়িয়ে রাখেন। মায়ের ভালোবাসার তুলনা নেই। তখনো হজরত ফাতেমা রা. এর কৈশোরাবস্থা পার হয়নি। রসুলে মকবুল হজরত মোহাম্মদ স. এর নবুয়তের দশম বৎসরে মা খাদিজা রা. ৬৬ বৎসর বয়সে সকলকে শোকসাগরে ভাসিয়ে অস্থায়ী দুনিয়ার

মায়ার বন্ধন ছিন্ন করে সেই অনন্ত অসীম পরম বন্ধুর উদ্দেশ্যে পাড়ি জমালেন। নির্ভয় আশ্রয় হারিয়ে ফাতেমার কচি মন এক অব্যক্ত বেদনায় নীল হয়ে গেলো।

হজরত খাদিজার রা. তিরোধানে রসুলে মকবুল স.ও অত্যন্ত শোকাভিভূত হয়ে পড়েন। তিনি ছিলেন রসুলেপাক স. এর সুযোগ্য সহধর্মিণী। ইসলামের উষালগ্নে একমাত্র সাহায্যকারী ও পৃষ্ঠপোষক। যখন মানুষ তাঁকে মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়েছে– তখন হজরত খাদিজা রা. তাঁকে সত্য নবী হিসাবে স্বীকার করেছেন, যখন মানুষ কাফের ছিলো হজরত খাদিজা তখন ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এহেন ব্যক্তিত্বের তিরোধানে রসুলেপাক স. এর সাংসারিক জীবনে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। তদুপরি বিপদের দিনের একমাত্র আশ্রয়স্থল চাচা আবু তালিবও এই সময়ে ইন্তিকাল করেন। পরপর দুই হিতাকাংখীর মৃত্যুতে রসুলেপাক স. অত্যন্ত মর্মাহত হন। এ কারণে এ বৎসরকে 'আমুল হুজন' বা শোকের বছর বলা হয়। এতো শোক, এতো ব্যথা– সবই ভুলে যান তিনি স. আদরের দুলালী হজরত ফাতেমার শোকাহত মুখের দিকে চেয়ে। তাঁকে সান্ত্বনা দেন। সস্নেহে মুছে দেন চোখের পানি। ফাতেমার মায়ের দায়িত্বও তাঁকেই পালন করতে হয়।

আল্লাহ্তায়ালার উদ্দেশ্য মনুষ্যচিন্তাধারার অনেক ঊর্ধ্বে। মঙ্গলময় রহমানুর রহিম তিনি। তিনি যা ঘটান তা মঙ্গলের জন্যই। সাময়িকভাবে ক্ষতিকর মনে হলেও এক সময় দেখা যায় মানুষের সামগ্রিক কল্যাণের জন্য তার প্রয়োজন ছিলো। উদ্দেশ্যবিহীন কোনো কাজই আল্লাহ্তায়ালা কখনো করেন না।

আল্লাহ্ যার প্রতি প্রসন্ন, যাকে তিনি রহমত দান করেন, নানাভাবে তিনি তাকে পরীক্ষা করে থাকেন। কুমোর যেমন সামান্য কাঁদা মাটিকে নানা প্রক্রিয়ায় একটি পরিপূর্ণ পাত্রে রূপ দেয় তেমনি হক-তবারক তায়ালা তাঁর প্রিয়জনকে নানা পদ্ধতিতে নানা পর্যায় অতিক্রান্ত করিয়ে আস্তে আস্তে নিজের কাছে টেনে নেন।

প্রিয় নবী হজরত মোহাম্মদ স. এর আদরের দুলালী হজরত ফাতেমা রা. অতি অল্প বয়স থেকেই নানা দুঃখ-কষ্টের মধ্যে বড় হয়েছেন। আজীবন তিনি পিতার পবিত্র সাহচর্যে কাটিয়েছেন। পিতার অপরিসীম দুঃখ-বেদনা, ঘাত-প্রতিঘাতের সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিলো তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময়। নানা পরীক্ষার মধ্য দিয়ে তিনি অত্যন্ত সাফল্যজনকভাবে বিশ্বের নারী জাতির আদর্শরূপে গড়ে তুলেছিলেন নিজেকে। বস্তুতঃ এটাই ছিলো পরম করুণাময় আল্লাহ্পাকের একান্ত ইচ্ছা।

মাতৃহারা বালিকা ফাতেমা পিতৃস্নেহে বড় হয়ে উঠছেন। মাতৃবিয়োগের পর থেকে পিতার কাছ ছাড়া হননি কখনো তিনি। পিতার স্নেহ ভালোবাসায় মায়ের শোক প্রশমিত করতে পেরেছিলেন অনেকটা। পিতৃ চরিত্রের পুরোপুরি প্রভাব এ সময় থেকেই ফাতেমা চরিত্রে প্রতিফলিত হতে থাকে। ধর্ম-কর্মে, স্বভাব-চরিত্রে

এবং সংসারের যাবতীয় কাজে অত্যন্ত পারদর্শিনী হয়ে উঠেন তিনি। পিতৃ সেবার একক দায়িত্বও বালিকা ফাতেমা নিজের কাঁধেই তুলে নেন। তাঁর জ্যেষ্ঠা ভগ্নিগণ যখন প্রতিবেশী বান্ধবীদের সাথে খেলাধুলায় মত্ত থাকে, তিনি তখন পিতার একান্ত সান্নিধ্যে থেকে তাঁর সেবা যত্ন করেন এবং নানা বিষয়ে আলোচনা করেন। তাঁর উপদেশ শ্রবণ করেন এবং সেইভাবে নিজের চরিত্র গঠনে যত্নবান হন। তাঁদের আলোচনার বিষযবস্তুও ভিন্ন প্রকৃতির। আল্লাহ্, তাঁর সৃষ্টি, জন্ম-মৃত্যু, বেহেশত, দোজখ ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করতেন। একদিন আলোচনা প্রসঙ্গে নূরনবী স. বললেন– ফাতেমা, নবী-কন্যা বলে তুমি নিজের মনে কখনো অহংকারকে স্থান দিও না। কারণ, অহংকারীকে আল্লাহ্ পছন্দ করেন না। একজন মানুষ নিজ নিজ কর্মোপযোগী পুরস্কারই আশা করতে পারে। একের সম্মানের ভাগীদার অন্যজন হতে পারে না। নবী কন্যা হলেও তোমার কৃতকর্মের পুরস্কারই আল্লাহ্ তোমাকে দিবেন। সুতরাং সাবধান! শেষ বিচারের দিন তোমার সৎগুণাবলীই তোমার একমাত্র রক্ষাকবচ। তোমার জন্য আল্লাহ্র কাছে করুণা চাইতে পারবো না আমি। কাজেই নিজের পাথেয় নিজেই সঞ্চয় করো। পিতার এ উপদেশ ফাতেমার মনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিলো। জীবনে কোনোদিনই তিনি অন্তরে বিন্দুমাত্র অহংকারকে স্থান দেননি।

বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিকূল পরিস্থিতি ও নানা রকম বাধা বিপর্যয় অতিক্রম করে স্থানান্তরে ঘুরতে হয়েছে রসুলেপাক স.কে। পিতার উত্থান-পতন, ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে হজরত ফাতেমাকেও বহুসংকট ও সহনশীলতার চরম পরীক্ষা অতিক্রম করতে হয়েছে।

মক্কা জীবনের বিপদগ্রস্ত অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য হজরত রসুলে মকবুল স. সেই সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র ইচ্ছাতেই মদীনায় হিজরত করেন। এ সময় হজরত ফাতেমাকে শত্রুবেষ্টিত মক্কাতে কিছুদিনের জন্য অবস্থান করতে হয়। মদীনায় পৌঁছে রসুলপাক স. আবু আইয়ুব আনছারী রা. এর গৃহে অবস্থান করেন এবং যথাসত্বর মসজিদে নববী তৈরীর কাজ শুরু করেন। পরিবারের জন্য মসজিদ সংলগ্ন কয়েকটি কুঠিরও তৈরী করান। প্রায় ছয়মাস পর তিনি যায়েদকে মক্কা পাঠান, তাঁর পরিবার পরিজনদের নিয়ে আসতে। হজরত উম্মে কুলসুম রা, হজরত ফাতেমা রা. এবং বিমাতা ছওদা রা. একত্রে যায়েদের সঙ্গে মদীনায় আগমন করেন। শুরু হয় মদীনার জীবন। সে সময় হজরত ফাতেমা রা. পূর্ণ যৌবনা।

যৌবন কালটাই মানব জীবনের সর্বোত্তম সময়। শারীরিক গঠনে, মানসিক বিকাশে, রূপ-লাবণ্যের পূর্ণ পরিস্ফুটন ঘটে এ সময়ে। হজরত ফাতেমা ছিলেন

এমনিতেই অসাধারণ সুন্দরী। যৌবনের সুললিত কোমল স্পর্শে রূপ-লাবণ্যে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেন তিনি। এ সময় আল্লাহ্ তাঁর পবিত্রতাকে চরমভাবে বিকশিত করেন।

ইতোমধ্যেই হজরত ফাতেমা রা. সাংসারিক কাজ-কর্মে পারদর্শিনী হয়ে উঠেছেন। যাবতীয় কাজ তিনি নিজ হাতেই সম্পাদন করেন।

পিতা ছিলেন সর্বকালের সর্বজনের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষা গুরু। তাঁর হাতেই তো ছিলো ইহ-পরকালের বাদশাহীর ঝাণ্ডা। অথচ তিনি নিজ হাতে জুতা সেলাই করতেন, ঘর ঝাড়ু দিতেন, জামা-কাপড়ে তালি লাগাতেন, বাজার করতেন, মাঠে বকরী চরাতেন রাখাল বালকের মতো। প্রয়োজনে ইহুদীর বাড়িতেও কামলা দিতেন। এহেন পিতার সন্তান– তাঁর হাতেই তিলে তিলে গড়ে উঠা কন্যা ফাতেমা কি হতে পারেন বিলাসী বা অহংকারী?

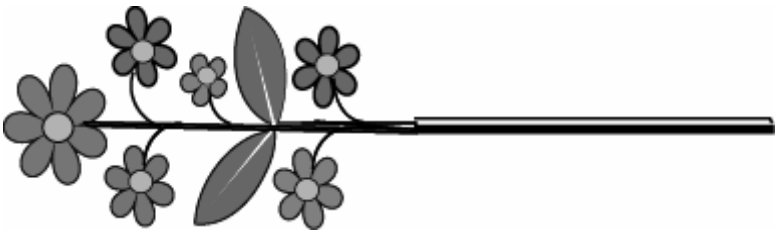

হজরত ফাতেমা জোহরা রা. ছিলেন পিতা-মাতার সর্বকনিষ্ঠা সন্তান। হজরত খাদিজার গর্ভে মোট ছয়জন ছেলে-মেয়ে জন্মগ্রহণ করেন। কন্যা সন্তানগণ হলেন– হজরত যয়নব রা., হজরত রোকাইয়া রা, হজরত উম্মে কুলসুম রা. ও হজরত ফাতেমা রা.। পুত্রদ্বয় হলেন– হজরত কাশেম রা. ও হজরত ইব্রাহিম রা.। পুত্রদ্বয় অতি অল্প বয়সেই ইন্তেকাল করেন। হজরত ফাতেমার অন্যান্য বোনদের বিবাহ সম্পন্ন হয় হজরত মোহাম্মদ স. এর নবুয়ত লাভের পূর্বেই। তাছাড়া বালিকা বয়সে মাকে হারিয়ে হজরত ফাতেমা রা. পিতৃ সাহচর্যে বড় হয়ে উঠেন। এ কারণেই পিতার নবুয়তী বৈশিষ্ট্যসমূহ হজরত ফাতেমা-চরিত্রে পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হয়েছিলো। পিতার চাল-চলন, কথা-বার্তা, আচার-আচরণ, দুস্থদের প্রতি দয়া-দাক্ষিণ্য, কষ্ট-সহিষ্ণুতা, ধৈর্যশীলতা, লজ্জা-সম্ভ্রম, সত্যভাষণ, উদারতা, আল্লাহ্র প্রতি নির্ভরতা প্রভৃতি আদর্শ চরিত্রের সার্থক উত্তরাধিকারিণী ছিলেন হজরত ফাতেমা রা.।

একবার কয়েকজন সাহাবা হজরত আয়েশা রা.কে জিজ্ঞাসা করলেন– রসুলেপাক স. এর সবচেয়ে প্রিয় কে ছিলেন? উত্তরে তিনি বলেন– নারীদের মধ্যে কন্যা ফাতেমা রা. এবং পুরুষদের মধ্যে ফাতেমা রা. এর স্বামী হজরত আলী রা.।

হজরত আয়েশা রা. আরও বলেন– ফাতেমা রা. ছিলেন রসুলেপাক স. এর হুবহু প্রতিরূপ। যখন তাঁকে দেখতাম তখন মনে হতো রসুল স.কে দেখছি, যখন তাঁর কণ্ঠস্বর শুনতাম, মনে হতো রসুল স. এর কণ্ঠস্বর শুনছি।

হজরত আয়েশা রা. এর উপরোক্ত উক্তি থেকেই বোঝা যায়, পিতা-পুত্রীর মধ্যে কতোখানি সাদৃশ্য ছিলো। এ জন্য রসুলেপাক স. হজরত ফাতেমা রা.কে অন্তরের সমস্ত স্নেহ ভালোবাসা উজার করে দিয়েছিলেন। হজরত ফাতেমা পিতাকে শুধু পিতা হিসাবেই নয়, নবী হিসাবেও ভক্তি-শ্রদ্ধা করতেন। পিতা-পুত্রীর মধ্যে এমন গভীর সম্পর্ক পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

উহুদ যুদ্ধে মসুলমানগণ পরাজিত হয় (হিজরী তৃতীয় সন)। এ যুদ্ধেই নবী করিম স., এর দন্ত মোবারক শহীদ হয়। যুদ্ধে বিধ্বস্ত মুসলমানদের মধ্যে রসুলেপাক স. এর শাহাদাত বরণের মিথ্যা সংবাদ ছড়িয়ে পড়লো। এ সংবাদে মদীনায় মর্মান্তিক শোকার্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। শোকাহতা ফাতেমা দিশেহারার মতো ছুটে গেলেন উহুদ প্রান্তরে। ছুটে এলো নিবেদিতপ্রাণ মুসলমানেরা ভুল সংবাদ পেয়ে। শেষে সবাই প্রকৃত সংবাদে জানতে পারলেন যে, নিহত নয়, আহত হয়েছেন মহানবী স.। পবিত্র মুখমণ্ডল থেকে রক্ত ঝরছিলো তখনো। সকলেই ঘিরে আছে তাঁকে। হজরত আলী রা. ঢাল ভরে পানি আনলেন, আর ফাতেমা রা. ধুয়ে দিতে লাগলেন ক্ষত স্থান। কিন্তু রক্ত বন্ধ হয় না কিছুতেই। অবশেষে একখানা চাটাই পোড়ানো হলো এবং তার ছাই ক্ষত স্থানে লাগানোর সাথে সাথে রক্ত পড়া বন্ধ হলো। লজ্জাশীলা ফাতেমা পিতার বিপদের কথা শুনে ঘরে বসে চোখের পানি ফেলে মনের সান্ত্বনা খুঁজে পেতে চাননি। ছুটে এসেছেন মদীনা থেকে যুদ্ধের ময়দানে। পিতার প্রতি সন্তানের গভীর অনুরাগ না থাকলে কি এমন হয়?

মহানবী স. ফাতেমাকে প্রায়ই বলতেন– তুমি যার প্রতি প্রসন্ন থাকো আল্লাহ্ও তার প্রতি সন্তুষ্ট। তুমি যার প্রতি অসন্তুষ্ট আল্লাহ্ও তার উপর নারাজ। মহানবী স. প্রায়ই বলতেন, ফাতেমা আমার দেহের অংশ। যে তাকে কষ্ট দিলো সে যেনো আমাকেই কষ্ট দিল। যে তাকে সন্তুষ্ট করলো সে যেনো আমাকেই সন্তুষ্ট করলো।

নবীজী কখনো সফরে গেলে কন্যাকে কাছে ডেকে সস্নেহে মাথায় হাত বুলাতেন, কপালে চুমু খেতেন। তারপর মেয়েকে রাজী করিয়ে সফরে যেতেন। ফিরে এসে প্রথমে মসজিদে গিয়ে দুরাকাত নামাজ পড়তেন। এরপর ঘরে ফিরে প্রথমেই কন্যার খোঁজ নিতেন। পাশে বসিয়ে কুশলাদি জিজ্ঞেস করতেন। পরে

অন্য কাজে মনোযোগী হতেন। হজরত ফাতেমা রা. এর বিবাহ পরবর্তী কালেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয়নি।

বিবি ফাতেমা কখনো পিতার সাক্ষাতে গেলে তিনি অন্যসব কাজ ফেলে আদরের দুলালী কন্যার কাছে চলে আসতেন নিজের আসন ছেড়ে। হাত ধরে নিজের পাশে বসাতেন। আগমনের কারণ জিজ্ঞেস করতেন। আবার রসুলেপাক স. কন্যাকে দেখতে গেলে তিনিও দৌড়ে পিতার কাছে চলে আসতেন। বসা অবস্থায় থাকলে আসন ছেড়ে সসম্মানে উঠে দাঁড়াতেন। নিজের আসন ছেড়ে দিতেন পিতাকে বসবার জন্য।

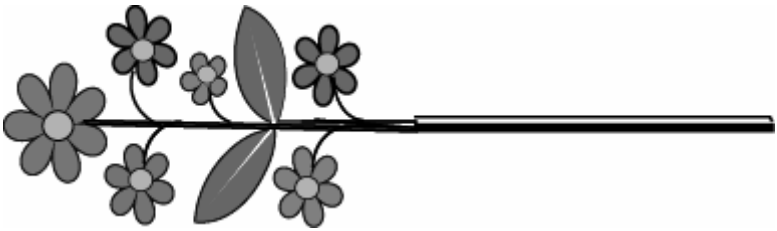

নবী নন্দিনী ফাতেমা ছিলেন ধৈর্যের এক অটল প্রতীক। শত দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও তিনি ছিলেন সদা-হাস্যময়ী। কিন্তু পিতার কোনো দুঃখ দেখলে কিংবা বিপদের সংবাদ পেলে দিশেহারা হয়ে পড়তেন। বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের মতো সব কিছু ফেলে ছুটে যেতেন পিতার কাছে।

মানুষ প্রবৃত্তির দাস। যতোক্ষণ পর্যন্ত প্রবৃত্তিকে নিজের নিয়ন্ত্রণে না আনতে পারে, ততোক্ষণ তার মানবসত্তার পরিপূর্ণতা আসে না। প্রবৃত্তি থেকেই আসে লোভ এবং পরশ্রীকাতরতা। পরিণতিতে মানুষের সাথে মানুষের সংঘাত সৃষ্টি হয়। হজরত ফাতেমা জোহরা রা. ছিলেন পিতা বিশ্বনবীর স. আদর্শ অনুসরণকারিণী। অতি অল্প বয়সেই তিনি প্রবৃত্তিকে নিজের আয়ত্বে এনেছিলেন। কাজেই তাঁর সাথে কারো কোনো সংঘাতের কারণ ঘটেনি। এক ঘটনায় জানা যায়, প্রতিবেশী ইহুদী শামাউন নানাভাবে কষ্ট দিতো ফাতেমা রা.কে। কিন্তু তিনি এজন্য কখনো তাকে বদদোয়া করেননি। উক্ত ইহুদী দম্পতি ইসলামে দীক্ষা নেয়ার পর কপর্দকশূন্য অবস্থায় তার স্ত্রীর মৃত্যু হলে নবী নন্দিনী নিজে তার শেষকৃত্য সম্পাদনের ব্যবস্থা করেন। এই উদারতার জন্য শামাউন অত্যন্ত বিস্মিত হন। এই মহৎহৃদয়া নবীদুহিতার প্রতি শ্রদ্ধায় অবনত হয়ে আসে তাঁর মস্তক। তাঁর পূর্বকৃত অপরাধের জন্য বার বার ক্ষমা ভিক্ষা করেন তিনি।

বিমাতাদের সাথেও নবী দুহিতার মনোমালিন্য হয়নি কখনো। বরং অত্যন্ত সুসম্পর্ক বিদ্যমান ছিলো। সবাই আপন সন্তানের মতোই স্নেহ করতেন তাঁকে। তিনিও গর্ভধারিণী মায়ের মতো ভক্তি শ্রদ্ধা করতেন সবাইকে।

হজরত আবু বকর তনয়া আয়েশা রা. ছিলেন ফাতেমার রা. মাত্র অল্প কিছুদিনের বড়। তাঁরা পরস্পর নাম ধরে ডাকতেন বান্ধবী হিসাবে। কিন্তু যখনই নবীজী স. হজরত আয়েশা রা.কে পত্নী হিসাবে ঘরে আনেন, তখনই ফাতেমা তাঁকে মায়ের আসনে কবুল করে নেন। মায়ের মতোই ভক্তি-শ্রদ্ধা ও সম্মান দেন। ফাতেমা চরিত্রের এ এক বিস্ময়কর দিক। মা আয়েশা রা.ও নবী কন্যাকে সন্তানের মতো বাৎসল্য দিতে কখনো কার্পণ্য করেননি।

হজরত মোহাম্মদ স. অন্যান্য সহধর্মিণীর চেয়ে হজরত আয়েশা রা.কেই বেশী ভালোবাসতেন। রূপ-লাবণ্য এবং যৌবনের মাধুর্য এ ভালোবাসার ভিত্তি ছিলো না। ধর্মের প্রতি গভীর অনুরাগই ছিলো এর মূল কারণ। তাঁর ধীশক্তি, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, গভীর প্রজ্ঞা এবং শরীয়তের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ শক্তি ছিলো অতুলনীয়। ধর্মীয় ব্যাপারে তাঁর মতামত অনেক বিশিষ্ট সাহাবীদের চেয়ে বেশী গুরুত্ব বহন করতো। শরীয়তের অনেক সূক্ষ্ম এবং জটিল প্রশ্নে হজরত আয়েশা রা. এর অভিমতকে অগ্রাধিকার দেয়া হতো। একারণেই হজরত আয়েশা রা. রসুলেপাক স. এর উম্মতগণের মধ্যেও এক অনন্য মর্যাদার আসন লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

একবার হজরত আয়েশা রা.কে অধিক ভালোবাসার অভিযোগ এনে অন্যান্য বিবিগণ হজরত ফাতেমা রা.কে মধ্যস্থ করলেন, হজরত স.কে বলবার জন্য। বিমাতাগণের অভিযোগ নিয়ে পিতার স্মরণাপন্ন হলে রসুলেপাক স. ফাতেমাকে বললেন– মা, আমি যা পছন্দ করি, তুমি কি তা করো না?

বুদ্ধিমতী ফাতেমার জন্য এই একটি বাক্যই যথেষ্ট ছিলো। তিনি ফিরে এসে বিমাতাদের বললেন– আপনাদের এ অভিযোগের মধ্যস্থতা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কোনো পক্ষ-পাতিত্বের মধ্যে যাওয়ার ইচ্ছা তাঁর ছিলো না। কারণ, তিনি প্রত্যেককেই সমানভাবে সম্মান করতেন। বিমাতাগণও সকলেই সমান দৃষ্টিতে দেখতেন বলেই তাঁর মধ্যস্থতার ব্যাপারে কেউ দ্বিমত পোষণ করেননি।

হজরত ফাতেমা রা. এর মধ্যে বিভিন্নমুখী গুণাবলীর সমাবেশ ঘটেছিলো বলেই তিনি বিভিন্ন গুণবাচক নামে ভূষিতা হয়েছেন।

হজরত ফাতেমা রা. এর হৃদয় ছিলো অত্যন্ত কোমল। বিকশিত ফুলের মতোই সৌরভময়। এজন্য তাঁকে বলা হতো জোহরা বা কুসুম কলি।

ফাতেমাকে বতুল নামেও অভিহিত করা হতো। 'বতুল' শব্দের অর্থ সংসার বা দুনিয়াদারীর প্রতি অনাসক্তি। অতি অল্প বয়স থেকে ফাতেমা রা. ছিলেন ভোগ-

লালসামুক্ত। পার্থিব সম্পদের প্রতি উদাসীনা। বতুল নামকরণের সার্থকতা সেখানেই।

রাজিয়া মরজিয়া ছিলো ফাতেমার আর এক নাম। সুখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে, আল্লাহ্‌র ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল ছিলেন তিনি। আল্লাহ্‌র দেয়া নেয়ামতের শুকরগুজারী করতেন সব সময়। রাজিয়া মরজিয়া নামের সার্থকতা এখানেই।

ফাতেমার আর এক নাম ছিলো যাকিয়া। পুত-পবিত্র চরিত্রের অধিকারিণী ছিলেন তিনি। তাই পিতা মোহাম্মদ মোস্তফা স. প্রিয়তমা কন্যার যাকিয়া নামকরণ করেছিলেন।

সাইয়্যেদা অর্থ শ্রেষ্ঠ। হজরত ফাতেমা রা. জীবনের সর্বক্ষেত্রে নারীকুলের এক মহান আদর্শ। আল্লাহ্‌ তাঁকে দুনিয়া এবং আখেরাতে নারীজাতির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। এজন্য তাঁকে সাইয়্যেদাতুন্নিছা বলা হয়।

হজরত আয়েশা রা. এর একটি উক্তি থেকে হজরত ফাতেমা রা. এর শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করা যায়। তিনি বলেন– একমাত্র মহানবী সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যতীত হজরত ফাতেমা রা. এর মতো উত্তম ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ আমি দেখিনি।

হজরত আয়েশা রাদি আল্লাহু তায়ালা আনহা অনেক সময় সতীন কন্যা ফাতেমা রাদি আল্লাহু তায়ালা আনহার সাথে বান্ধবীসুলভ হাসি তামাশাও করতেন। একদিন তিনি কন্যাকে বললেন– ফাতেমা, বলোতো তোমার আমার মধ্যে কে উত্তম? উত্তরে ফাতেমা রা. বললেন– আমিই। কারণ, বিশ্ব নবীর স. রক্তধারা আমার দেহে বহমান। হজরত আয়েশা রা. বললেন– ইহকালে তুমিই উত্তম। কিন্তু, পরকালে আমি। কারণ, রসুলুল্লাহ স. এর সাথে তখন আমিই বসবাস করবো। কথাটা বলেই মা আয়েশা রা. জিজ্ঞাসু নেত্রে কন্যা ফাতেমার দিকে হাসি মুখে তাকিয়ে রইলেন উত্তর শোনার জন্য। কিন্তু হজরত ফাতেমা রা. কি বলবেন, ভেবে পেলেন না। চুপ করে রইলেন। কন্যার এ হেন অবস্থা দর্শনে জননী সহাস্যে তাঁর কাছে গিয়ে বসলেন। তাঁর মাথায় স্নেহস্পর্শ বুলিয়ে দিয়ে বললেন– ফাতেমা, ইহ-পরকালে তুমিই উত্তম মর্যাদার দাবীদার। আহা! আমি যদি তোমার মাথার এক গুচ্ছ চুলও হতাম!

নিতান্ত বালিকা বয়স থেকেই ফাতেমা গম্ভীর প্রকৃতির ছিলেন বলে সমবয়সী অন্যান্য বালিকাগণও তাঁর সঙ্গে মিশতো না। তবে হজরত আবু বকর রা. এর কন্যা হজরত আয়েশা রা. এবং হজরত আসমা রা. , হজরত উমর রা. তনয়া হাফসা রা. এবং জোবায়ের রা. এর কন্যা ফাতেমা প্রায়ই নবী দুহিতার কাছে আসা-যাওয়া, মেলামেশা করতেন। ফলে ফাতেমা চরিত্রের অনেকটা তাঁদের

চরিত্রে প্রতিফলিত হয়েছিলো। পরবর্তী জীবনে তাঁরা প্রত্যেকেই আদর্শ নারী হিসাবে সমাজে বরণীয়া হয়েছিলেন।

মহানবী স. বলতেন– হে রমণীগণ, তোমরা নিজের শিক্ষার জন্য বিশ্বের চারজন মহিলার আদর্শ অনুসরণ করতে পারো। তাঁরা হলেন ফেরাউনের স্ত্রী আছিয়া রা, ইমরান কন্যা মরিয়ম রা. খুয়াইলিদ কন্যা খাদিজা রা. এবং মোহাম্মদ কন্যা ফাতেমা রা.।

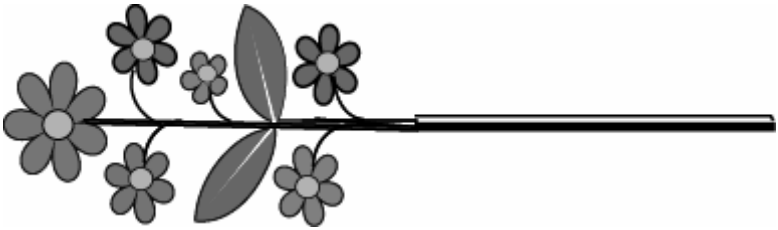

হজরত ফাতেমা জোহরা রা. আঠারোয় পা রাখলেন। পরিপূর্ণ যৌবনা। বিবাহের উপযুক্ত বয়স। আরবের বিভন্ন গোত্রের সম্ভ্রান্ত ও সুযোগ্য পাত্রগণ বিবাহের প্রস্তাব পাঠাতে লাগলেন অহরহ। প্রায় সকল প্রস্তাবই ছিলো ফাতেমার জন্য উপযুক্ত। রূপ, মহত্ব, ধর্মভীরুতা, লজ্জাশীলতা প্রভৃতি দুর্লভ গুণাবলীর অধিকারিণী ছিলেন হজরত ফাতেমা রা.। তদুপরি নবী কন্যা। এহেন ভাগ্যবতী যুবতীকে পত্নী হিসাবে পাওয়ার জন্য সকলেই ছিলেন সমান আগ্রহী। নবী স. এসব প্রস্তাবে আগ্রহ প্রকাশ করেননি। তাঁর মনে কন্যার বিবাহের বিষয়টা উদয় হয়নি এমন নয়। তবে তিনি ছিলেন বিশ্ব-নিয়ন্তা সর্বশক্তিমান এক আল্লাহ্‌র উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। তাঁর ইচ্ছা ছাড়াতো তিনি কোনো কাজ করতে পারেন না। সেই ইঙ্গিতের অপেক্ষায়ই হজরত ফাতেমার বিবাহের ব্যাপারে নীরব রইলেন হজরত স.। তাছাড়া প্রাণাধিক কন্যাকে তিনি কখনই কাছছাড়া করতে চাননি। সেই বিশ্ব স্রষ্টার ইচ্ছাও বুঝি তাই ছিলো। তবে কোনো প্রস্তাবই সরাসরি বাতিল করে না দিয়ে মৌনতা অবলম্বন করেন তিনি। অবশেষে প্রস্তাব এলো। উপযুক্ত প্রস্তাব। সাড়া দেবার মতো প্রস্তাব। দ্বীনের নবী হজরত মোহাম্মদ স. এর মনের গভীরের সুপ্ত আকাঙ্খা যেনো স্বয়ং আল্লাহ্‌র ইচ্ছাতেই প্রাণবন্ত হয়ে উঠলো।

হজরত আলী রা. ছিলেন দ্বীনের নবী স. এর চাচা আবু তালিবের পুত্র। সম্পর্কে চাচাতো ভাই।

ইসলামের ইতিহাসে হজরত আলী রা. উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো ভাস্বর। বাল্যকাল থেকেই তিনি রসুলেপাক স. এর প্রিয় সান্নিধ্যে লালিত পালিত হয়েছেন।

তিনি ছিলেন নবী স. এর হুবহু অনুসারী। মাত্র দশ বৎসর বয়সেই তিনি ইসলামে দীক্ষা নেন। ইসলামের প্রাথমিক সংকটকালে হজরত আলী রা. এক বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। যুদ্ধ-বিগ্রহে, ধর্ম-প্রচারে, সুখে-দুঃখে সর্বাবস্থায় ইসলামের একনিষ্ঠ সেবক হিসাবে রসুলুল্লাহ স. এর পাশে থেকে শত্রুর মোকাবিলা করেছেন হজরত আলী রা.। এমনকি রসুলেপাক স. এর হিজরতের সময় তিনি শত্রুর তরবারীর নিচে মাথা রেখে নবীজীর বিছানায় নিশ্চিন্তে ঘুমিয়েছেন সারারাত। ইসলামের অস্তিত্বকে সুদৃঢ় করার জন্য তিনি বারবার মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছেন। তাঁর এই ত্যাগ, তিতিক্ষা এবং সহাসিকতার জন্য তাঁকে খোদার বাঘ বা 'শেরে খোদা' হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছিলো। কিন্তু স্বভাবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত নম্র এবং লাজুক। পবিত্রতা এবং সৌন্দর্যের প্রতীক। হজরত ফাতেমা ছিলেন সৌরভমণ্ডিত সদ্যবিকশিত একটি পবিত্র পুষ্প। সেই পবিত্রতাকে একান্তভাবে নিজের করে পাওয়ার গভীর বাসনা আলীর মনের মণিকোঠায় সুপ্ত ছিলো। কিন্তু নিজের আর্থিক দৈন্যের কারণে তিনি একথা প্রকাশ করতে সাহস করেননি কখনো। বিষয়টা হজরতের বিশিষ্ট সাহাবীদের উৎসাহে হজরত আলীর মনে উজ্জীবিত হয়ে উঠে। এ ব্যাপারে হজরত উমর রা. বিশেষভাবে উৎসাহ যোগান। তাঁর দৃঢ় ধারণা ছিলো, মহানবী স. আলীকেই জামাতা হিসাবে বরণ করে নেবেন। তখন আলীর বয়স হয়েছিলো চব্বিশ বৎসর।

হজরত উমর রা. এর আন্তরিক উৎসাহে নবী দুহিতার পানিপ্রার্থী হয়ে আলী রা. রসুলূল্লাহর দরবারে উপস্থিত হলেন। কিন্তু কিছু বলতে সাহস পেলেন না। তাঁর হৃদপিণ্ডের স্পন্দন বেড়ে গেলো। হারিয়ে গেলো মুখের ভাষা। অবনত মস্তকে বসে রইলেন আলী। মহানবী স. আলীর রা. মনোভাব বুঝতে পেরে বললেন– আলী, তুমি কি ফাতেমার বিয়ের ব্যাপারে কিছু বলতে চাও? হজরত আলী মাথা নেড়ে সম্মতি প্রকাশ করলেন। নবীজী বললেন– এ ব্যাপারে ফাতেমার সম্মতির প্রয়োজন। তুমি বসো, আমি তার মতামত জেনে আসি। অতঃপর নবী করিম স. অন্দরে প্রবেশ করে কন্যার মতামত জানতে চাইলেন। ফাতেমা রা. সম্পূর্ণ নীরব রইলেন। তাঁর এ মৌনতার মাঝেই সম্মতির প্রকাশ ঘটেছিলো।

দ্বীনের রসুল স. এর অন্তরের গভীরে প্রোথিত সুপ্ত আকাঙ্খাই আজ বাস্তবে পরিণত হতে চলেছে। বস্তুতঃ এটাই ছিলো সর্বশক্তিমান বিশ্ব-স্রষ্টার ইশারা।

নবী স. মনে মনে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। মহান আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে শুকরিয়া আদায় করলেন। অতঃপর হজরত আলী রা.কে ডেকে বললেন–

- প্রিয় আলী, মোহরানা আদায় করবার মতো তোমার কিছু আছে কি?

আলী বললেন–

- হে আল্লাহ্‌র নবী, আপনিতো জানেন আমি সহায় সম্বলহীন। মোহরানা আদায় করবার মতো কিছুই নেই আমার।

নবী স. বললেন–

- বদর যুদ্ধে প্রাপ্ত লৌহ বর্ম আর ঘোড়াটি কোথায়?

উত্তরে আলী রা. বললেন– আছে।

এবার রসুলেপাক স. আলীকে বললেন–

- যুদ্ধের জন্য ঘোড়ার প্রয়োজন। বর্মটি বিক্রয় করো।

হজরত আলী রা. লৌহ বর্মটি চারশত আশি দিরহাম মূল্যে হজরত ওসমান রা. এর নিকট বিক্রি করলেন (টাকার হিসাবে বর্মটির মূল্য ১২৫/-টাকা)। হজরত ওসমান বর্মটি পুনরায় হজরত আলী রা.কে উপহারস্বরূপ দিয়েছিলেন। বিক্রয়লব্ধ সমুদয় অর্থ নবী স. এর খেদমতে পেশ করলেন হজরত আলী রা.। রসুলেপাক স. দিরহামগুলো হজরত বেলাল রা. এর হাতে দিলেন। হজরত বেলাল বাজার হতে কিছু সুগন্ধি এবং এক ঝুড়ি খেজুর কিনে আনলেন। অতঃপর রসুলুল্লাহ স. হজরত আনাছ রা.কে নির্দেশ দিলেন আনছার ও মোহাজেরগণকে ডেকে আনতে। হজরত আনাছ রা. তখনই সোৎসাহে বেরিয়ে পড়লেন বিশ্বনবীর আদরের কন্যার বিবাহের দাওয়াতের পয়গাম নিয়ে। কিছুক্ষণের মধ্যেই হজরত আবু বকর, ওমর, ওসমান, তালহা, যোবায়ের রা. এবং অন্যান্য মোহাজের ও আনছারগণ বিবাহ মজলিশে উপস্থিত হলেন।

সকল মেহমানগণের উদ্দেশ্যে দোজাহানের শাহানশাহ্‌ মিম্বরে দাঁড়িয়ে খোতবা দিলেন– শোকরিয়া সেই মহান আল্লাহ্‌র প্রতি, যিনি সৃষ্টি করেছেন ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল আর সৃষ্টি করেছেন মানুষকে নরনারী রূপে এবং নেয়ামত স্বরূপ দান করেছেন নবী ও ধর্মের মাধ্যমে মানুষকে করেছেন মর্যাদাশালী। নর-নারীর দাম্পত্য বন্ধনকে করেছেন জরুরী। আল্লাহ্‌পাক এরশাদ করেছেন–

"এক ফোটা পানি হতেই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন সেই মহান আল্লাহ। স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যারূপে প্রেরণ করেছেন একে-অপরকে। সর্বশক্তিমান তোমাদের সৃষ্টিকর্তা। সমস্ত কিছুই নিয়ম মাফিক নির্দিষ্ট সময়ে সংঘটিত হয়।"

তোমরা সাক্ষী থাক, আমার প্রাণাধিকা কন্যা ফাতেমাকে আলী ইবনে আবু তালিবের সাথে চারশত দিরহাম মোহরের বিনিময়ে পরিণয়সূত্রে সম্প্রদান করছি। অতঃপর আলীকে জিজ্ঞাসা করলেন–তুমি রাজী আছো তো?

হজরত আলী রা. বললেন– 'আলহামদুলিল্লাহ' আমি কবুল করলাম।

এরপর রসুলেপাক স. হাত তুলে বললেন– হে দ্বীন দুনিয়ার মালিক, তুমি নবদম্পতির মঙ্গল বিধান করো। এই পরিণয়কে উভয়ের জন্য এবং ভবিষ্যৎ সন্তানদের জন্য তোমার অশেষ রহমত দান করো।

প্রার্থনা শেষে উপস্থিত সকলের মধ্যে খেজুর বিতরণ করা হলো।

দো-জাহানের বাদশাহ্, দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ মানব সাইয়্যেদুল আম্বিয়া হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মুজতবা স. এর স্নেহের পুতুলী, আদরের দুলালী সাইয়্যেদাতুন্নিছা হজরত ফাতেমা জোহরা রা. এর শুভ পরিণয় হিজরী দ্বিতীয় সনের জিলহজ্ব মাসে অত্যন্ত সাদামাটা এবং ভাবগম্ভীর পরিবেশে সুসম্পন্ন হলো। বিবাহে কোনো বাজনা বাজেনি। কোনো উৎসব হয়নি। বধুবেশে বিশ্ববরেণ্যা হজরত ফাতেমা জোহরা রা. এর পরনে ছিলো মলিন বসন। ইহ এবং পর জগতের বাদশাহ্জাদীর শাদী মোবারক এভাবেই সুসম্পন্ন হলো কপর্দকহীন যুবক হজরত আলী রা. এর সঙ্গে। মহানবী স. এর এক বিশিষ্ট সাহাবী উম্মে আয়মন জিজ্ঞেস করলেন– কয়েকদিন আগে সাধারণ এক আনসার কন্যার বিবাহে এতো আয়োজন, এতো জাঁকজমক, আনন্দ-রুসমত হলো অথচ নারী জগতের মধ্যমণি সাইয়্যেদাতুন্নিছার শুভ বিবাহ কতোই না সাধারণভাবে সম্পন্ন হলো।

মহানবী স. বললেন– দুনিয়ার কোনো বিবাহের সঙ্গে ফাতেমা এবং আলীর বিবাহের তুলনা হতে পারে না।

মহানবী স. প্রাণাধিকা কন্যা বিশ্বনেত্রী হজরত ফাতেমা রা. এর বিবাহের যৌতুকস্বরূপ দিয়েছিলেন একটি খাট, দুটো রূপার বাজুবন্দ, খেজুর পাতা ভর্ত্তি একটি চামড়ার তোশক, একটি বকরী, পানি তোলার একটি মশক, আটা পিষবার দুটি যাঁতা এবং দুটি মাটির কলসী ও একটি জায়নামাজ। প্রিয়তমা পত্নীকে হজরত আলী রা. উপহার স্বরূপ দিয়েছিলেন তাঁর নিজস্ব সমস্ত সম্পদ– একটি বকরী ও একটি পুরাতন চাদর। এ উপহারগুলো হজরত ফাতেমা জোহরা রা. আজীবন অত্যন্ত যত্ন সহকারে নিজের কাছে রেখেছিলেন। যৌতুকগুলোর দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করে মহানবী বললেন– হে আল্লাহ্, এগুলোকে তুমি কল্যাণময় করো।

হজরত আলী রা. তখন রসুলেপাক স. এর কাছেই থাকতেন। বিবাহের পর নব দম্পতির জন্য একটি ঘরের প্রয়োজন দেখা দিলো। হারেছ বিন যোমান আনসারীর কয়েকখানা ঘর ছিলো। তিনি ইতোমধ্যেই কয়েকখানা ঘর রসুলেপাক স.কে ছেড়ে দিয়েছিলেন। উপযাচক হয়ে তিনি নবদম্পতির জন্য আরও একটি ঘরের ব্যবস্থা করে দিলেন।

সমস্ত ব্যবস্থা সম্পন্ন করে মহানবী স. প্রাণাধিকা কন্যাকে হজরত আলীর হাতে তুলে দিবার জন্য ফাতেমার নিকট গেলেন। হজরত ফাতেমা তখন কাঁদছিলেন।

মহানবী স. তাঁর স্নেহের পুতুলি দেহের অংশ প্রিয়তমা কন্যা ফাতেমার চোখে পানি দেখে বিচলিত হয়ে পড়লেন। তাঁর চোখও অশ্রু ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো। কন্যার মাথায় সস্নেহে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন– মা, দুঃখিত হয়ো না। আমার বংশের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির হাতেই তোমাকে সমর্পণ করেছি। আলী দরিদ্র হতে পারে,

কিন্তু শিক্ষা-দীক্ষায়, চরিত্র-মাধুর্যে, ধর্ম-কর্মে, জ্ঞানে-গুণে, সাহসিকতায় তার সমকক্ষ কেউ নেই। সবদিক থেকে সে তোমার উপযুক্ত। তাছাড়া পরম করুণাময় আল্লাহ্‌র ইচ্ছাও তাই ছিলো।

পিতার কথা শুনে কান্না থামিয়ে ফাতেমা বললেন– সে জন্য আমি দুঃখ করছি না আব্বা। দুঃখ এই জন্য যে, আপনাকে ছেড়ে যেতে হবে। আর এমনদিনে আম্মাজানও বেঁচে নেই। কন্যার কথা শুনে হজরত খাদিজার রা. স্মৃতি সজীব হয়ে উঠল তাঁর মনের পর্দায়। ক্ষণিকের জন্য উদাস হয়ে গেলেন মহানবী স.। এক অব্যক্ত কান্নায় উদ্বেলিত হয়ে উঠলো সারা অন্তর। চোখ ছাপিয়ে কান্না আসতে চাইলো। কিন্তু সংযত রাখলেন তিনি নিজেকে। নিজ হাতে প্রাণপ্রিয় কন্যার চক্ষু মুছে দিলেন।

অতঃপর হজরত আলীকে কাছে ডেকে বললেন– প্রাণাধিক আলী, আজ আমি স্নেহের দুলালীকে তোমার হাতে তুলে দিচ্ছি। সে তোমার সুখ-দুঃখে সম-অংশীদার। তাকে সুখী রাখতে চেষ্টা করো। ভুলত্রুটিগুলো সংশোধন করে দিও। বাইরের কাজগুলো তোমার। সাবধান! ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার মোহে জড়িয়ে আখেরাতকে ধ্বংস করো না।

এরপর ফাতেমা রা.কে উদ্দেশ্য করে বললেন– মা, স্বামীর পদতলে স্ত্রীলোকের বেহেশত। সুতরাং কখনো তাঁর অবাধ্যতা করো না, সেবাযত্নে অবহেলা করো না। তাঁর সন্তুষ্টিতেই তোমার মুক্তি। ছোটখাট ব্যাপার নিয়ে কখনো ঝগড়াঝাটি করো না। অবাধ্য স্ত্রীলোকের ইবাদত আল্লাহ্‌র দরবারে কবুল হয় না। অহংকার করো না। কারণ, অহংকার মানুষকে ধ্বংসের পথে টেনে নেয়। স্বামীর গৃহের আঙ্গিনাই স্ত্রীলোকের জন্য উত্তম। গৃহের যাবতীয় কাজগুলো নিজ হাতেই সম্পাদন করো। সব সময় আল্লাহ্‌র শোকর গুজারী করবে। বিপদে ধৈর্য অবলম্বন করবে। লোভ, হিংসা, ক্রোধ, পরশ্রীকাতরতা মানুষকে বিপথে টেনে নেয়। নেক কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

স্বামীর প্রতিটি জিনিস হেফাজত করবে। সর্বদা পরিচ্ছন্ন থাকবে। পরিচ্ছন্নতা ইমানের অর্ধেক। স্বামীর শয়নের পরে বিছানায় যাবে এবং তাঁর শয্যা ত্যাগের পূর্বে ঘুম থেকে জাগবে। নিয়মিত নামাজ আদায় করবে। রোজা রাখবে। বিপদে আপদে আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস রাখবে। ফাতেমা তখন লজ্জায় অবনতা ছিলেন।

এমনি ধরনের মূল্যবান উপদেশ দিয়ে কন্যা জামাতাকে মহানবী স. বিদায় দিলেন। নব-দম্পতি ভবিষ্যতে এক নতুন জীবনের সন্ধানে নতুন ঘরের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন।

মহানবীর স. চোখ অশ্রু ভারাক্রান্ত। হৃদয়ে হাহাকার। শূন্য ঘর। যে ঘরে ফাতেমা নেই, সে ঘরে কি করে মন স্থির থাকে? মনটা তাঁর মরুভূমির মতো

হাহাকার করে উঠলো। তিনি আর ঘরে থাকতে পারলেন না। অস্থিরভাবে ছুটে এলেন ফাতেমার নতুন গৃহের আঙ্গিনায়। নব-দম্পতি তখন ঘর সাজাতে ব্যস্ত। গৃহের আঙ্গিনায় দাঁড়িয়ে ভিতরে ঢোকার অনুমতি চাইলেন।

ঘরে ঢুকে রসুলেপাক স. একবাটি পানি আনালেন এবং উক্ত পানিতে দুহাত এক সঙ্গে ডুবিয়ে দিলেন। অতঃপর উক্ত পানি হজরত আলীর রা. বাহু ও সিনাতে ছিটিয়ে দিলেন। লজ্জাবনতা ফাতেমাকে কাছে ডেকে তাঁর উপরও সে পানি ছিটিয়ে দিলেন। এরপর উভয়কে উদ্দেশ্য করে বললেন– আজ থেকে তোমাদের নতুন জীবনের সূচনা। পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি রেখো। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের উপর আস্থা রেখো। এতেই তোমাদের মঙ্গল হবে। মুক্তি আসবে।

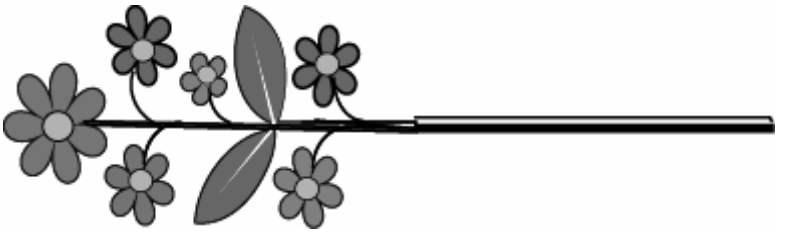

মানুষ স্বপ্ন দেখে। স্বপ্নে রাজসুখ অনুভব করে ভিখারীও। কিন্তু কঠোর বাস্তবের আবেষ্টনীর মধ্যে তা ভেঙ্গে যায়, গুড়িয়ে যায়। দুনিয়ার আর সব যুবতীর মতোই হয়তো হজরত ফাতেমা রা.ও স্বামী সংসারের সুখ-স্বর্গ রচনা করেছিলেন মনে মনে। কিন্তু স্বামী সংসারে সে সুখের ছিঁটে ফোটাও কোনোদিন তাঁর ভাগ্যে জোটেনি। স্বামীর ঘরে পা রেখেই হজরত ফাতেমা রা. সীমাহীন অভাবের মুখোমুখি হলেন। জীবনে কখনো তিনি সচ্ছলতার মুখ দেখেননি। কিন্তু ভেঙ্গে পড়েননি কখনো। জন্মের পর থেকেই তিনি অভাবের মধ্যে লালিত পালিত হয়েছেন।

জীবন যাঁদের সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে উৎসর্গীকৃত, তাঁদের কি দুনিয়ায় সামান্য সুখের চিন্তার অবসর মিলে? অভাব তাঁদের নিত্যদিনের সঙ্গী। জোটাতে পারলে খান, না হলে উপোস। অভাব অনন্ত, কিন্তু অভিযোগ নেই। সাধও নেই। সাধ্যও নেই। বিপদে-আপদে ধৈর্য অবলম্বন করা যেনো তাঁদের চারিত্রিক বেশিষ্ট্য। আল্লাহ্‌র শোকর গুজারী করে বিষাদময় সংসারকে এক পারলৌকিক অনাবিল শান্তির কেন্দ্রভূমিতে পরিণত করেন তাঁরা। এ শিক্ষা বিশ্বনবী মোহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মুজতবা সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের।

হজরত আলী রা. এর জীবনের অধিকাংশ সময় ইসলামের খেদমতে অতিবাহিত হয়। ইসলামের প্রতিষ্ঠালগ্নে রসুলেপাক পাক স. এর পাশে থেকে প্রায় সব সময়ই শত্রুর মোকাবেলা করতে হয়েছে। সংসারের জন্য অর্থ রোজগারের অবসর খুব কমই হয়েছে। সুযোগ পেলে বাইরে দিনমজুরী করে যা পেতেন, তা দিয়েই কোনো দিন এক বেলা খেয়ে, কোনো দিন উপোস করে দিন গুজরান করেছেন। একাধারে কয়েক দিন পর্যন্তও অনাহারে কেটেছে। এ জন্য স্বামীর প্রতি হজরত ফাতেমার কোনো অভিযোগ ছিল না। বস্তুতঃ পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি তাঁর কোনো আগ্রহও ছিলো না। সংসারের যাবতীয় কাজ তিনি নিজ হাতেই করতেন। যাঁতা ঘুরিয়ে গমের ময়দা তৈরী, রুটি বানানো, বাসন-কোশন মাজা, কাপড়-চোপর ধোয়া, স্বামী-সন্তানদের সেবা-যত্ন করা ইত্যাকার কাজ করতে কখনো তিনি কষ্ট অনুভব করেননি। যাঁতা ঘুরিয়ে আর মশকে পানি তুলে তাঁর হাতে কড়া পড়ে গিয়েছিলো। এ অবস্থা দেখে হজরত আলী রা. মনে মনে খুব কষ্ট পেয়ে একজন দাসীর জন্য পিতার কাছে যেতে তাকে অনুরোধ করলেন। ফাতেমা একজন দাসীর কথা, সৎমা হজরত আয়েশা রা. এর মাধ্যমে পিতাকে জানালেন। নবীজী তখন আদরের কন্যাকে বললেন– মা, নবীকন্যাদের অলসতা শোভা পায় না। তোমার নিজের কাজ নিজেরই করা উচিত।

সীমাহীন অভাবের মধ্যেও হজরত আলী রা. সব সময় সচেষ্ট থাকতেন প্রিয়তমা পত্নীকে সুখী রাখতে। একবার একছড়া সোনার হার পড়িয়ে দিলেন ফাতেমা রা.কে। কন্যার গলায় সোনার হার দেখে মহানবী স. অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। কন্যাকে বললেন– ফাতেমা, ইহা কি তোমার মনোকষ্টের কারণ হবে না যদি লোকে বলে, রসুলুল্লাহর কন্যা গলায় আগুনের বেড়ী পরেছে। পিতার কথা শুনে কন্যার মনে অনুশোচনা হলো, এই ধরনের বিলাসিতাকে নিজের মনে প্রশ্রয় দেয়ার জন্য। তিনি তখনই হার বেচে দিয়ে একটি গোলাম খরিদ করে আনলেন।

খায়বরের যুদ্ধে গনিমতের মাল থেকে একজন দাসী পাঠালেন নবীজী তাঁর প্রিয়তমা কন্যার জন্যে। কন্যাকে বললেন– ফাতেমা, সমস্ত কাজ ভাগ করে নিয়ে দুজনে মিলেমিশে করবে। মনে রেখো, দাসী হলেও সে মানুষ। তুমি যা খাও, যা পরো, তাই তাকে খেতে পরতে দিবে।

হজরত ফাতেমা রা. এর সংসারে স্থায়ীভাবে কোনো দাসদাসী ছিলো না। উম্মে আয়মন নামে তাঁর মায়ের আমলের একজন দাসী প্রায়ই তাঁর কাজে সাহায্য সহযোগিতা করতো। তবে ফাতেমা রা. এর জীবনের শেষ পর্বে স্থায়ীভাবেই উক্ত মহিলা তাঁর পাশে থেকেছেন।

দুনিয়ার বুকে এ যেনো কোনো আলাদা জগত, ভিন্ন পরিবেশ। আল্লাহ্তায়ালা যেনো ইচ্ছে করে এমনটি তৈরী করে দিয়েছেন। স্বামী-স্ত্রী দুজনে মিলে এই দুঃখ-

কষ্টের সংসারকে বেহেশতি মহিমায় মনোরম করে তুলেছেন। যেখানে শত দুঃখ-বেদনার মাঝেও বিরাজ করে স্থায়ী প্রশান্তি।

রসুলেপাক স. প্রায়ই কন্যাগৃহে যাতায়াত করতেন। আদরের কন্যাকে চোখের আড়ালে রেখে বেশীদিন থাকতে পারতেন না। একদিন এসে দেখেন আলী এবং ফাতেমা উভয়েই শায়িত অবস্থায় আছেন। নবী স.কে দেখেই তাঁরা তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে উঠতে গেলেন। মেয়ে–জামাতার দাম্পত্য জীবনে সুসম্পর্কের আবাস পেয়ে মনে মনে প্রীত হলেন রসুলেপাক স.। তাই উভয়ের উদ্দেশ্যে ইশারা করলেন তেমনিভাবে শুয়ে থাকতে। তিনি উভয়ের মাঝে গিয়ে বসে পড়লেন। হজরত আলী রা. রসুলুল্লাহ স. এর ডান পা এবং হজরত ফাতেমা রা. বাম পায়ের সঙ্গে বক্ষ মিলিয়ে উপবেশন করলেন। এ সময় রসুলেপাক স. অত্যন্ত উৎফুল্ল মনে অনেক সময় ধরে কথাবার্তা বললেন। কন্যা জামাতাকে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য অনেক হিতোপোদেশ দান করলেন। অতঃপর ফাতেমাকে পানি আনতে বললেন। বাটিভর্তি পানিতে দোয়া পড়ে ফুঁ দিলেন এবং কন্যা জামাতাকে খাওয়ালেন। পরিশেষে হাত তুলে দোয়া করলেন, ইয়া রহমানুর রহিম! তুমি এদের প্রতি এবং এদের ভবিষ্যত বংশধরদের প্রতি অনুগ্রহ দান করো, পবিত্রতা এনায়েত করো। পরস্পরের প্রতি তুমি মহব্বতের আকর্ষণ বাড়িয়ে দাও এবং এদেরকে হেফাজত করো।

মানুষ হলেও নবীপরিবারের সদস্যদের কাজে, কথায়, আচার-আচরণে অতিমানবীয় ঘটনা অনেক ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়। বাহ্যিক জীবন কেমন সাদামাটা ধরনের, আর আত্মিক জীবনে কতো অন্তহীন মাধুর্যের ফল্গুধারা। সে বৈচিত্রের সন্ধান কেবল এই পথের সহগামীরাই উপলব্ধি করতে পারেন। সমুদ্রের বারিরাশির মতো উপরে অশান্ত ঢেউ, যার নীচে স্থির শান্ত অতলান্ত পানিতে চিরকালের বহমান প্রশান্তি।

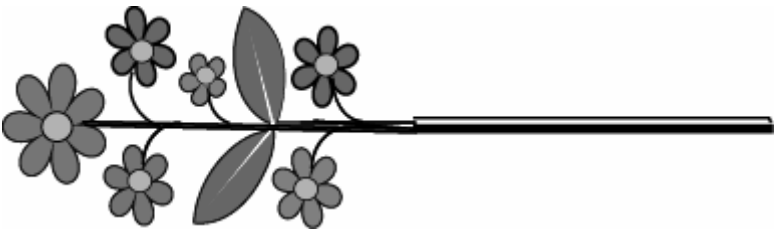

আলী-ফাতেমার সংসারে অভাব ছিলো অগণিত। বাইরে থেকে বোঝা যেতো ঠিকই কিন্তু সেজন্য কেউ কোনোদিন কোনো অভিযোগ শোনেনি। এদিকে তাঁদের

মনোযোগও ছিলোনা। শুধু যেটুকু একান্তই না হলে নয়, সেটুকুর জন্য চেষ্টা করেছেন। তবু সামান্য প্রয়োজনটুকুও অনেক সময় মেটেনি তাঁদের।

একবার হজরত আলী রা. ইহুদীর কাছে তিন দিনের চুক্তিতে শুধুমাত্র আহারের বিনিময়ে কাজ নিলেন। কাজ শেষে তিন দিন পর তিনি ঘরে ফিরলেন। চতুর্থদিনে হজরত ফাতেমা রা.কে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ঘরে কোনো খাবার আছে কিনা। উত্তর দিতে ফাতেমা রা. ইতস্ততঃ করছিলেন। আলী আবার জিজ্ঞেস করলেন– খাবার কিছু আছে কি?

অথচ গত তিনদিন থেকেই যে ঘরে কিছু নেই, কি করে তিনি তা শোনাবেন স্বামীকে। জানলে স্বামী লজ্জিত হবেন, ব্যথা পাবেন। সহধর্মিণীর চেহারা দেখেই বুঝতে পারলেন তিনি, যে ঘরে কিছু নেই। ফাতেমা অনাহারী। দারুন ব্যথিত হলেন হজরত আলী রা.। এ কি করে সম্ভব হলো! গত তিনদিন তিনি পেটপুরে খেলেন, অথচ তাঁরই সহধর্মিণী না খেতে পেয়ে ক্ষুধায় কাতর! বিমর্ষভাবে কিছুক্ষণ বসে রইলেন তিনি। অনুশোচনা আর মর্মব্যথায় তিনি মূক হয়ে গেছেন। পরে আবেগজড়িত কণ্ঠে শুধু বললেন– ফাতেমা, তুমি আমাকে ক্ষমা করো।

আর একদিন।

কাজের তালাশে দিন ফুরিয়ে গেলো। দিনের উজ্জ্বল আলো বিলীন হয়ে গেলো রাতের গাঢ় অন্ধকারে। এদিকে ক্ষুধায় ওষ্ঠাগত প্রাণ হজরত আলী।

অবশেষে কাজ মিললো। এক দোকানে সামান্য মজুরির বিনিময়ে বস্তা তোলার কাজ। কাজ শেষ হলো গভীর রাতে। ততোক্ষণে সব দোকান বন্ধ। এখন উপায়! একদিকে নিজে ক্ষুধার্ত, অন্যদিকে ঘরে অনাহারী স্ত্রী পথ চয়ে বসে আছে। সমস্ত বাজার ঘুরে একটি দোকান খোলা পেলেন আলী। মন তাঁর দুলে উঠলো আশার আনন্দে। সেখান থেকে তিনি যবের আটা কিনে আনন্দিত মনে বাড়ী ফিরলেন।

ফাতেমা তখনও স্বামীর আগমন অপেক্ষায় বসে আছেন। স্বামী ফিরলে ফাতেমা যবের আটার রুটি তৈরী করে স্বামীকে খাওয়ালেন। নিজে খেলেন। রাত তখন শেষ হয়ে এসেছে প্রায়।

অন্য আর একদিন।

এক টুকরো রুটি নিয়ে নবী দুহিতা মসজিদে নববীতে পিতার খেদমতে হাজির হলেন। মহানবী স. বললেন– এ রুটি কোথায় পেলে মা। ফাতেমা বললেন– কিছু যবের যোগাড় হয়েছিল। তাই পিষে আটা বানিয়ে রুটি তৈরী করেছি। আমরাও তিন বেলা উপোষ ছিলাম। এইটুকু আপনার জন্য নিয়ে এসেছি। রুটির টুকরোটি চিবোতে চিবোতে নবীজী বললেন– মা, চার বেলা উপোসের পর এ রুটিটুকু তোমার পিতার উদরে প্রবেশ করলো। আলহামদু লিল্লাহ্!

এমনি ধরনের দৃষ্টান্ত ছিলো নবী পরিবারের নিত্য সঙ্গী। ক্ষুধার তাড়নায় পেটে পাথর বেঁধে রেখেছেন। অথচ চাইলে তাঁরা দুনিয়ার বাদশাহী পেতেন। দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য জান কোরবান করেছেন। দুনিয়ার প্রতি কোনো মোহ ছিলো না। বাইরে তাঁদের যতোই অভাব থাকুক না কেনো ভেতরে ছিলো এক ঐশ্বরিক সম্পদের অফুরন্ত ভাণ্ডার। দোজাহানের বাদশাহ্ বিশ্ব নবী স. এর আদরের দুলালী হজরত ফাতেমার জীবনের অধিকাংশ সময়ে একখানার বেশী পরনের কাপড় ছিলো না। একবার কন্যাকে দেখতে এসে নবী স. ঘরে ঢোকার অনুমতি চাইলেন। আড়াল থেকে ফাতেমা রা. বললেন– আব্বাজান, আমার পরনের কোনো কাপড় নেই। শরীর ঢেকেছি একখণ্ড ছেড়া কাঁথায়। মহানবী স. মাথার পাগড়ী খুলে ভিতরে ছুঁড়ে দিয়ে বললেন– ফাতেমা এই পাগড়ীতে তোমার শরীর আবৃত করো।

হজরত ফাতেমা রা. কাঁথাখানা পরিধান করে পাগড়ী দ্বারা বক্ষ এবং মাথা আবৃত করলেন। ফাতেমার শরীর এতো দুর্বল ছিলো যে, কথা বলতে তাঁর খুব কষ্ট হচ্ছিল। রসুলেপাক স. সস্নেহে বললেন– ফাতেমা, তোমার কি অসুখ করেছে?

না আব্বাজান। কয়েকদিনের অনাহারে শরীর অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছে। স্নেহশীল পিতা! সন্তানের দুঃখে কে না ব্যথিত হয়? কার চোখ না অশ্রুসিক্ত হয়? কন্যার এহেন কথা শুনে রসুল স. আবেগজড়িত কণ্ঠে বললেন– মা, তুমিতো জানো দুনিয়ার সম্পদ চাইলে আল্লাহ্ আমাকে নিরাশ করবেন না, কিন্তু ইহজগতের সুখ-সম্পদের মোহ কখনো নবী-রসুলদের বিভ্রান্ত করতে পারে না। মানুষের হেদায়েতের পয়গাম নিয়ে এসেছি। মানুষের মুক্তির জন্যই উৎসর্গ করেছি এই জীবন। তাই ক্ষণস্থায়ী সুখের জন্য পরকালীন অনন্ত সুখকে বিসর্জন দিতে পারি না। আমিও আজ তিন দিন হলো অনাহারে আছি। সুতরাং দুঃখ করো না। সেই বিশ্বনিয়ন্তা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র কাছেই পানাহ্ চাও। তিনিই শান্তি দিবেন। শক্তি যোগাবেন। দুনিয়ায় ক্ষণস্থায়ী আরাম আয়েশের কথা কখনো মনে এনো না।

পিতার মুখ হতে এমনি ধরনের স্বর্গীয় উপদেশবাণী শ্রবণ করে কন্যা আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠলেন। শরীরের দুর্বলতা নিমেষে দূর হয়ে গেলো। অপার্থিব শক্তি এলো শরীরে। দু'হাত তুলে পরম করুণাময়ের কাছে পানাহ্ চাইলেন তিনি।

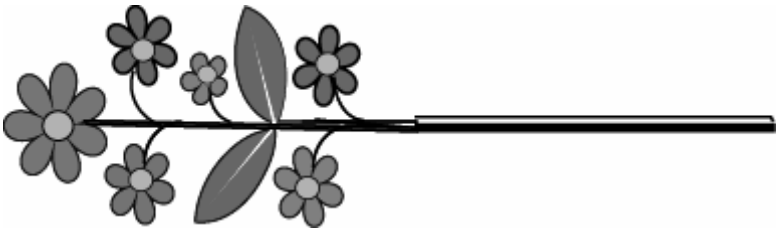

সংসার জীবনে অভাবই অশান্তির কারণ। ঐশ্বরিক প্রেমের ধারায় যাঁদের হৃদয় সিক্ত, সীমাহীন অভাব, অশেষ দুঃখ-কষ্ট তাঁদের আত্মিক প্রশান্তির পথে প্রতিবন্ধকতার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে না। আলী-ফাতেমার সংসার জীবনে পর্বতপ্রমাণ অভাব ছিলো। কিন্তু তাঁদের জীবন ইসলামের পথে উৎসর্গীকৃত ছিলো বলেই পার্থিব অভাব অনটনের ব্যথা হৃদয়স্পর্শ করতে পারেনি। তাঁদের দাম্পত্য জীবন ছিলো অত্যন্ত মধুর। পরস্পরে তাঁরা ছিলেন সমব্যথী। সংসার জীবনের শান্তি বজায় রাখতে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই সচেষ্ট থাকতেন। এমনি হাজার অভাবের মধ্যেই হিজরী তৃতীয় সনের ১৫ই রমজান হজরত ইমাম হাসান রা. জন্ম গ্রহণ করেন। হজরত ইমাম হোসাইন রা. জন্ম গ্রহণ করেন চতুর্থ হিজরীর শাবান মাসে। হজরত ফাতেমার গর্ভে মোট পাঁচ সন্তান– ৩টি কন্যা ও ২টি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ইমাম হাসান এবং হোসাইন রা. ইসলামের ইতিহাসে নানা কারণে এক বেদনাদায়ক পরিণতির শিকার হন। হজরত ফাতেমার সন্তানদের বলা হয় সাইয়্যেদ। সাইয়্যেদ অর্থ শ্রেষ্ঠ বা নেতা।

ইমামদ্বয় ছিলেন প্রিয় নবীর প্রাণতুল্য। হজরত স. ইমাম হাসানের ভূমিষ্ঠ হওয়ার সংবাদ পেয়ে ছুটে আসেন কন্যা গৃহে। সদ্যজাত শিশুকে কোলে নিয়ে নিজ জিহবা শিশুর মুখে পুরে দেন এবং লালা লেহন করান। হোসাইনের ভূমিষ্ঠের সংবাদ পেয়েও তেমনিভাবে ছুটে গিয়ে কোলে তুলে নেন নবজাতককে। কিন্তু পূর্বেই মাতৃ দুগ্ধ পান করানোর জন্য তাঁকে লালা লেহন করাতে পারেননি। হজরত রসুলে করীম স.-ই প্রিয় দৌহিত্রদ্বয়ের নামকরণ করেন।। হজরত আলী রা. এক পুত্রের নাম রেখেছিলেন হরব, কিন্তু রসুল স. তা বাতিল করে দেন। দৌহিত্রদ্বয়কে তিনি অত্যন্ত ভালোবাসতেন। একদিন তাঁদের কোলে নিয়ে তিনি আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করলেন– আয় মাবুদ, আমি এদের মহব্বত করি, তুমিও এদের প্রতি অনুগ্রহ দান করো। যারা এদের মহব্বত করে তুমিও এদের মহব্বত করো। তিনি প্রায়ই বলতেন– যারা এদের মনে কষ্ট দেয় তারা যেনো আমাকেই কষ্ট দেয়। একদিন মহানবী স. ইমাম হোসাইনের কান্না শুনে কন্যাকে বললেন– ফাতেমা, তুমি কি জানো না ওদের কান্না শুনলে আমি বড়ই বিচলিত হই।

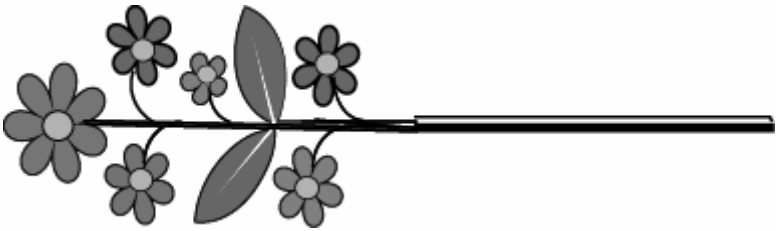

মানুষ অতিন্দ্রিয় নয়। সংযম আর অধ্যবসায়ের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে অতিমানবীয় গুণাবলীর সমাবেশ ঘটে। কাজেই কিছু ভুল ভ্রান্তি থাকা মানব চরিত্রের স্বাভাবিক ব্যাপার। মানবীয় ধর্মের অংশ। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মধুর দাম্পত্য সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও হজরত ফাতেমা এবং হজরত আলীর রা. মধ্যেও মাঝে মাঝে মনোমালিন্য হতো কিন্তু কখনো তাঁরা ন্যূনতম সীমা অতিক্রম করেননি। একদিন স্বামী-স্ত্রীর কথপোকথনের এক পর্যায়ে হজরত ফাতেমা রা. এর একটি কটুবাক্য শুনে আলী রা. মনে ব্যথা পেলেন। কোনো কথা না বলে তিনি ঘর হতে বেরিয়ে গেলেন। সমস্ত দিন বাইরে কাটালেন। রাতেও ঘরে ফিরলেন না। এ সংবাদ মহানবীর স. কানে গেলো। তিনি আলীকে খুঁজতে বের হলেন। আলী তখন মসজিদের ধূলো-বালির মাঝে শুয়েছিলেন। রসুলেপাক স. সস্নেহে ডাক দিলেন– ওহে আবু তুরাব, (ধূলো-বালির জনক) গৃহে চলো। সঙ্গে সঙ্গে হজরত আলী রা. উঠে পড়লেন। মহানবীর সঙ্গে ঘরে ফিরলেন। ঘরে ফিরে রসুল স. উভয়ের মধ্যে সমঝোতা এনে দিলেন।

অন্য আর একদিন। কোনো কারণে স্বামীর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে পিতার কাছে নালিশ করলেন হজরত ফাতেমা। স্ত্রীর সাথে সাথে আলীও সেখানে উপস্থিত হলেন। অভিযোগের জবাবে পাল্টা অভিযোগ না করে অবনত মস্তকে তিনি নীরবতাই অবলম্বন করলেন।

অভিযোগ শুনে মহানবী স. জামাতাকে কিছুই জিজ্ঞেস করলেন না। বরং ফাতেমাকেই বললেন– স্বামী সব ব্যাপারেই স্ত্রীর মতামতের অনুসারী হবে, এমন কোনো কথা নেই। তোমারও ধৈর্য ধারণ করা উচিত। পিতার উপদেশ শুনে হজরত ফাতেমা রা. নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। অতঃপর স্বামীর সাথে গৃহে ফিরলেন।

ঘটনা সামান্য। উপদেশের মাধ্যমে মহানবী স. শুধু কন্যাকেই নয়, জামাতাকেও শাসন করলেন। ছোট-খাট ব্যাপারে একে অন্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা মোটেই উচিত নয়। হজরত আলী রা. এর ভাষায়– এ ঘটনায় রসুলুল্লাহ স. তাঁর কন্যাকেই শুধু ভুল শুধরিয়ে দেননি, প্রকারান্তরে আমারও যথেষ্ট শিক্ষা

হয়েছে। এ জন্য আমি যারপরনাই অনুতপ্ত হয়েছিলাম। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম কোনোদিন ফাতেমার মতের বিরুদ্ধাচারণ করবো না।

হজরত আলী রা. এর কথা থেকেই বোঝা যায় যে, তিনি তাঁর স্ত্রী হজরত ফাতেমা রা.কে কতো ভালোবাসতেন। এ তাঁর মনের অভিব্যক্তির পূর্ণ প্রকাশ। ভালোবাসার গভীরতা না থাকলে এমনভাবে বলা যায় না।

আবু জাহেলের কন্যার সঙ্গে হজরত আলীর বিবাহের প্রস্তাব উঠেছিলো একবার। খোদ রসুলেপাক স. এর কাছেই প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল কন্যাপক্ষ থেকে। রসুল স. খুব অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। রসুল স. এর নয়নের মণি আর তাঁর দুশমনের কন্যা এক ঘরে থাকতে পারে না। হজরত আলী রা.ও এ প্রস্তাব পছন্দ করেননি।

প্রিয়তমা পত্নীর মনোকষ্টের কারণ হতে পারে এমনকিছু কখনো করেননি হজরত আলী রা.। ছোটো খাটো ঘটনা বাদ দিলে তাঁদের দাম্পত্য জীবন ছিলো অত্যন্ত সুখের।

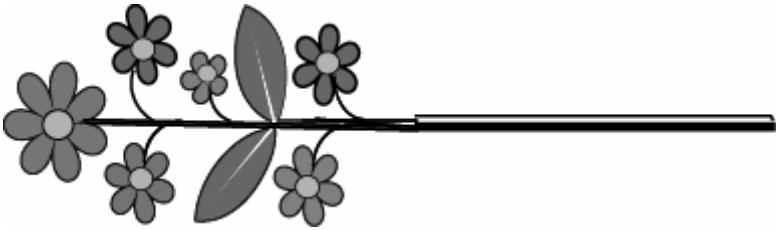

রসুলের কন্যা। শেরে খোদার জীবনসঙ্গিনী, ইমামদ্বয়ের জননী। সবদিক থেকেই হজরত ফাতেমা জোহরা রা. মহিমান্বিতা। আপন প্রতিভায় ভাস্বর। তাঁর চরিত্র বৈশিষ্ট্য, বিভিন্নমুখী গুণাবলী দিয়েছে তাঁকে বিশ্বের নারী সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম আসন। কিন্তু এসব ব্যাপারে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ উদাসীনা। আত্মঅহমিকা কখনো তাঁর মনে স্থান পায়নি। বরং বিনয়, নম্রতা, শিষ্টাচার দ্বারা সকলকে স্থায়ীভাবে প্রভাবিত করেছেন। সবার কাছ থেকেই কুড়িয়েছেন শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা।

সত্যবাদিতা ছিলো তাঁর জীবনের ভূষণ। জীবনে কখনো মিথ্যা বলেছেন এমন কথা শোনা যায় না। সমস্ত জীবনটাই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলো তাঁর।

স্বামী হলো স্ত্রীর অলংকার। ফুলের বৈশিষ্ট্য সুগন্ধে। স্ত্রী ফুল। স্বামী সুগন্ধ। সুগন্ধ বিকশিত হয় ফুলের প্রকাশের মধ্যে। স্ত্রীর নিষ্ঠাই স্বামীকে মহিমান্বিত করে তোলে।

স্বামীর পায়ের নিচে স্ত্রীর জান্নাত। এ কথার উপর পুরোপুরি শ্রদ্ধাশীলা ছিলেন হজরত ফাতেমা রা.। স্বামী সংসারে অভাব-অনটন, দুঃখ-কষ্ট ছিলো নিত্য সঙ্গী। এমনও দেখা যায়, একাধিক্রমে কয়েকদিন পর্যন্ত চুলোয় হাঁড়ি উঠেনি। কিন্তু এ জন্য তাঁর মনে ক্ষোভ ছিলো না। কোনো অভিযোগ ছিলো না পিতা অথবা স্বামীর বিরুদ্ধে। বরং হাসি মুখেই তা বরণ করে নিয়েছেন। আর বেশী বেশী করে আল্লাহ্‌র শোকর গুজারী করেছেন। এতো অনটনের মধ্যে আজীবন তিনি একান্ত নিষ্ঠা সহকারে স্বামী-সন্তানের সেবা-যত্ন করেছেন। স্বামীকে না খাইয়ে নিজে কখনো খাননি। স্বামীকে ঘুম না পাড়িয়ে নিজে কখনো ঘুমাননি। স্বামীর আগেই তিনি ঘুম থেকে জেগেছেন। তাঁর সেবা-যত্নের প্রতি কখনো তিনি অমনোযোগী হননি। মৃত্যুর কিছুক্ষণ আগেও স্বামী-সন্তানদের জন্য অজু গোসলের পানি তুলে রেখেছেন। খাবার জন্য রুটি বানিয়েছেন।

প্রায়ই স্ত্রী লোকগণ নবী দুলালীর কাছে উপদেশ প্রার্থিনী হতেন। তিনি তাদের বলতেন– নিয়মিত নামাজ আদয় করবে। প্রত্যহ ফজর এবং এশা নামাজের পর যতোটুকু সম্ভব কোরআন পাঠ করবে। স্বামীর সেবা করবে। কেননা, রসুলে মকবুল স. বলেন–স্বামীর পদতলেই স্ত্রীর বেহেশত। তিনি আরও বলেন– দুনিয়ায় যদি আর কারো প্রতি সেজদা করার বিধান থাকতো, তবে আমি স্ত্রী লোকদের বলতাম তাদের স্বামীদের সেজদা করতে।

অতএব স্বামীর অবাধ্য হয়ো না। বিশ্বাস ভঙ্গ করো না। তাঁর আমানতের খেয়ানত করো না। তবেই তোমাদের মুক্তি।

লজ্জা ইমানের অঙ্গ– নারীর ভূষণ। হজরত ফাতেমা রা. এর মতো লজ্জাশীলা রমণী তৎকালীন জাহেলী আরবে দ্বিতীয় আর কেহ ছিলেন না।

এক মজলিশে উপস্থিত সাহাবাদের উদ্দেশ্য করে নবীজী বললেন– স্ত্রীলোকের সর্বোত্তম সম্পদ কি? সবাই নীরব। অর্থাৎ এর উত্তর কারো জানা নেই। এ প্রশ্নটি হজরত আলী রা. নবী দুহিতাকে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন– লজ্জাশীলতা। লজ্জাশীলতাই রমণীর উৎকৃষ্টতম গুণ। পর-পুরুষের প্রতি দৃষ্টি না দেয়া এবং পর-পুরুষের দৃষ্টি থেকে নিজেকে আড়াল করে রাখা লজ্জাশীলতার নিদর্শন। কথাবার্তা, চলাফেরা, আচার-আচরণের মধ্যেও শালীনতা থাকতে হবে। শালীনতাই নারীকে বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করে।

একদিনের ঘটনা।

নবীজী এক নাবালক ছেলেকে সাথে নিয়ে আদরের কন্যাকে দেখতে গেলেন। ফাতেমার পরিধানের কাপড়টি ছিলো খুব খাটো। ঐ কাপড়ে মাথা ঢাকলে পায়ের নীচের অংশ উন্মুক্ত থাকে। পা ঢাকলে মাথা উন্মুক্ত হয়। ছেলেটিকে দেখে ফাতেমা রা. ব্যস্তভাবে, একবার পা, একবার মাথা আবরিত করতে সচেষ্ট হলেন। কিন্তু

কোনদিক সামলাবেন? মেয়ের ব্যস্ততা দেখে মহানবী স. বললেন– ফাতেমা, এতো কুণ্ঠিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। তোমার সামনে তোমার জন্মদাতা পিতা এবং একটি নাবালক ছেলে ছাড়া অন্য কেহ নেই।

অন্য আর এক ঘটনা।

আদরের দুলালীকে নিয়ে নবীজী আলাপ করছিলেন। এমনি সময়ে সাহাবা আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মকতুম রা সেখানে এলেন। তাঁকে দেখেই হজরত ফাতেমা রা. উঠে চলে গেলেন। কাজ শেষ করে উম্মে মকতুম রা. চলে গেলেন। পুনরায় নবী দুলালী সেখানে প্রবেশ করলে নবীজী বললেন– মা, উম্মে মকতুমকে দেখে তুমি চলে গেলে কেন? সে তো অন্ধ। সবিনয়ে ফাতেমা বললেন– আব্বাজান, সে অন্ধ বলে আমাকে দেখেনি। কিন্তু আমিতো তাঁকে দেখছিলাম।

মা ফাতেমা সব সময় নিজ সম্ভ্রমের প্রতি শ্রদ্ধাশীলা ছিলেন। তাঁর মৃত লাশের সম্ভ্রমের জন্যও তিনি অসিয়ত করেছিলেন, রাতের অন্ধকারে যেনো তাঁকে দাফন করা হয়। বেশী লোক যেনো জানতে না পারে। মনে মনে ইহাও আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, তাঁর কবর যেনো কেউ চিনতে না পারে। এমনকি তাঁর গোসলের দায়িত্বও নানী হজরত আসমা এবং স্বামী হজরত আলীর উপর ন্যস্ত করেছিলেন। প্রকাশ থাকে যে, পরম করুণাময় আল্লাহ্ নবী নন্দিনীর প্রতিটি আকাংখাই পূরণ করেছিলেন। সে রাতে হজরত ফাতেমা রা. এর কবরের উভয় পার্শ্বে আরও ছয়জন স্ত্রী লোকের দাফন কার্য সম্পাদন করা হয়েছিলো। এ থেকে বোঝা যায় পরম করুণাময় আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় বান্দার আকাংখা কখনো অপূর্ণ রাখেন না।

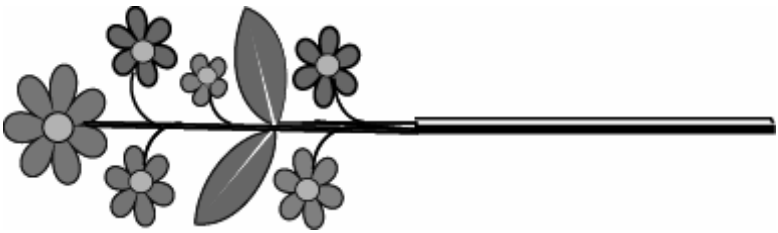

একদিন নবী নন্দিনী হজরত ফাতেমা রা. (বতুলের) বাড়ীর দরজায় ক্ষুধার্ত এক ভিখারী এসে হাত পাতলো– মাগো, কিছু খেতে দিন। দু'দিন কিছু খাইনি। অনাহারী ভিক্ষুকের কাতর মিনতি। কেঁদে উঠলো ফাতেমার হৃদয়। কি দিয়ে বিদায় করবেন অনাহারীকে। ঘরে যে কিছুই নেই। তিনি নিজেও তো শিশু সন্তানদের নিয়ে অনাহারে আছেন। দোজাহানের বাদশাহ্ রসুলে মকবুল স. এর কন্যা শেরে খোদা

হজরত আলীর রা. প্রিয়তমা পত্নী কি করে শূন্য হাতে ফিরিয়ে দেবেন দরিদ্র মিসকিনকে! ইমাম হাসান হোসাইনের বিছানার একখণ্ড চামড়া তুলে দিতে চাইলেন ভিখারীকে। ক্ষুধার্ত সে! চামড়া দিয়ে কি হবে। চাই খাদ্য। কিন্তু খাদ্য কোথায়? অগত্যা নিজের কণ্ঠহারখানা তুলে দিলেন ক্ষুধার্তের হাতে। বাজারে বিক্রি করে খাবার কিনতে পারবে। দান মানুষকে উদার করে। মনকে প্রফুল্ল রাখে। দানশীল ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাদের মধ্যে গণ্য।

পিতা একটা নতুন জামা বানিয়ে দিয়েছেন প্রিয়তমা কন্যাকে। ফাতেমা অত্যন্ত খুশী। ছিন্ন বসনা এক ভিখারিণী একটি জামা প্রার্থী হলো ইতোমধ্যেই। ফাতেমার দান করবার মতো পুরাতন জামা ছিলো একটা। হোক সে ভিখারিণী। উত্তম জিনিসই তাকে দেওয়া উচিত। সুতরাং নতুন জামাটিই তাকে দিয়ে দিলেন। খুশী মনে চলে গেলো স্ত্রী লোকটি। তা দেখে ততোধিক পরিতৃপ্ত হলো হজরত ফাতেমা রা. এর হৃদয়-মন।

বালক ইমাম হোসাইন কঠিন রোগাক্রান্ত। সন্তানের রোগ মুক্তির জন্য তিনদিন রোজা মানত করলেন জননী। আল্লাহ্ তাঁর প্রার্থনা কবুল করলেন। রোগমুক্ত হলেন হোসাইন। এবার জননী প্রতিশ্রুত নফল রোজা শুরু করলেন হৃষ্ট চিত্তে।

প্রথম দিন।

ইফতারের জন্য কয়েক টুকরো রুটির ব্যবস্থা করা হয়েছে। এক ক্ষুধার্ত ভিখারী হাজির হলো সন্ধ্যা বেলা। ইমাম-জননীর দুয়ার থেকে কেউ শূন্যহাতে ফিরে যায় না। ইফতারের জন্য রাখা রুটির টুকরোগুলো নির্দ্বিধায় তুলে দিলেন তিনি ক্ষুধার্তের হাতে। নিজে খেলেন শুধু পানি।

দ্বিতীয় দিন।

ইফতারের আয়োজন কয়েকটা খুরমা মাত্র। ইফতারের পূর্ব মুহূর্তে তাও তুলে দিতে হলো অন্য এক অনাহারীকে।

তৃতীয় দিন।

প্রথম এবং দ্বিতীয় দিনের পুনরাবৃত্তি হলো এদিনও। পরপর তিনদিন সারাদিনের উপবাসের পর নিজের সামান্য খাবারটুকু ক্ষুধার্তের হাতে তুলে দিতে একটুও বিরক্তি বোধ করেননি হজরত ফাতেমা রা.। বরং মুক্ত হস্তে দান করে তিনি তৃপ্ত হয়েছেন।

সিরিয়ার এক ধনাঢ্য মহিলার নাম ফাতেমা। একবার তিনি নবী দুহিতার পুত-চরিত্র এবং বিভিন্ন গুণাবলীর কথা শুনে নানা উপঢৌকনসহ তাঁর সাক্ষাৎপ্রার্থিনী হলেন। উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত জিনিষপত্রগুলো সাথে সাথেই দান করে দিলেন গরীব-দুঃখীদের মধ্যে। নবী নন্দিনীর এ রকম মহত্বের পরিচয় পেয়ে উক্ত মহিলা বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেলেন।

হজরত সালমন ফারসী রা.।

বিশিষ্ট সাহাবী। ক্ষুধার্ত নও মুসলিম এক যুবককে নিয়ে হাজির হলেন হজরত ফাতেমা রা. এর বাড়িতে। ঘরে কদিন থেকে কিছুই ছিলো না। তাঁরা নিজেরাও ছেলেদের নিয়ে অনাহারী। নবী দুলালীর ঘর থেকে মেহমান না খেয়ে ফিরে যেতে পারে না। নিজের ব্যবহারের চাদরখানা সাহাবীর হাতে তুলে দিয়ে ইহুদী শামাউনের কাছে পাঠালেন। সব শুনে শামাউন চাদর না রেখেই কিছু ময়দা দিয়ে দিলেন। তাড়াতাড়ি রুটি তৈরী করে সবগুলোই মেহমানকে দেয়া হলো। নিজের জন্য এবং ক্ষুধার্ত সন্তানদের জন্য কিছুই রাখলেন না তিনি।

হজরত ইমাম হাসানের বর্ণনা–

আমরা দু'বেলার অনাহারী। কিছু ময়দার ব্যবস্থা হলো। আম্মা রুটি বানালেন। আব্বা এবং আমাদের দু'ভাইকে খাওয়ালেন। তারপর তিনি নিজে খেতে বসলেন। এমনি সময়ে এক ভিখারী হাজির হয়ে বললো– হে নবী কন্যা, তিন বেলার ক্ষুধার্ত আমি। আমাকে খেতে দিন। আম্মা মুখের গ্রাস নামিয়ে রাখলেন। খাবারগুলো আমার হাতে দিয়ে বললেন– ভিখারীকে দিয়ে এসো এগুলো। আমরা দু'বেলা খাইনি। কিন্তু সে যে তিন বেলার অনাহারী। সুতরাং তার প্রয়োজন বেশী।

একবার কতিপয় স্ত্রী লোক জাকাত সম্পর্কে হজরত ফাতেমাকে প্রশ্ন করলেন– চল্লিশটি উটের মালিককে কত জাকাত দিতে হবে।

নবী দুহিতা বললেন– সাধারণ মানুষের জন্য মাত্র একটি উট। জীবনের সর্বাবস্থায়, সর্বক্ষেত্রে যারা আমার অনুসারী তাদেরকে সবগুলো উটই বিলিয়ে দিতে হবে।

উল্লিখিত ঘটনাবলী থেকে সহজেই অনুমিত হয়, নবী নন্দিনী ফাতেমা কতো উদার মনের অধিকারিণী ছিলেন। জীবনে সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র প্রতি নির্ভরশীল ছিলেন বলেই তাঁর পক্ষে নিঃশেষে সবকিছু বিলিয়ে দেয়া সম্ভব হয়েছিলো।

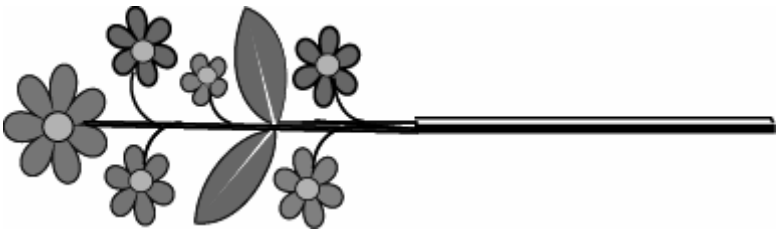

ফুল সৌন্দর্যের প্রতীক। শুধু এর বাহ্যিক রূপই নয়– এর সুগন্ধও অন্তর্নিহিত আকর্ষণ সহস্রগুণে বাড়িয়ে দেয়। হজরত ফাতেমা জোহরার রা. বাহ্যিক রূপ এবং

আধ্যাত্মিক গুণাবলীর একত্র সমন্বয় ঘটেছিলো বলেই জগতে তিনি মহিয়সী-গরিয়সী। এ কারণেই তিনি ছিলেন প্রিয় নবী স. এর নয়নের নিধি। যখনই মনে পড়তো, মহানবী স. তখনই সব কিছু ছেড়ে ছুটে যেতেন প্রিয়তমা কন্যার একান্ত সান্নিধ্যে।

একদিন গৃহদ্বারে পা রেখেই একটি দৃশ্য দেখে থমকে দাঁড়ালেন মহানবী স.। গৃহের এক ধারে বসে ফাতেমা এক হাতে যাঁতা ঘুরিয়ে গমের আটা পিষছেন। অন্য হাতে শিশু হাসানকে দুধ খাওয়াচ্ছেন। সম্মুখে কোরান শরীফের হাতে লেখা আয়াতসমূহ। এমন দৃশ্য দেখে কার না চোখে পানি আসে। কন্যার অবস্থা দেখে বিশ্ব নবীর স. চোখও অশ্রুসিক্ত হলো। দোজাহানের বাদশাহ্‌র আদরের কন্যা যাঁতা ঘুরিয়ে হাতে ফোসকা ফেলছেন। হৃদয়ে তাঁর আনন্দ শিহরণ বয়ে গেলো, শত দুঃখ কষ্টের মধ্যেও আল্লাহ্‌র প্রতি ফাতেমার এতো গভীর নিষ্ঠা দেখে আবেগাপ্লুত কণ্ঠে কন্যাকে বললেন– দুনিয়ার এ সামান্য দুঃখ কষ্টে বিচলিত হয়ো না মা। ধৈর্য অবলম্বন করো। আল্লাহ্‌ তোমাকে উত্তম পুরস্কার দান করবেন।

হজরত ফাতেমা রা. এর সংগ্রামী জীবনে এবাদত বন্দেগীতে কখনো শৈথিল্য দেখা যায়নি। নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ও কোরান পাঠ, তসবিহ্‌ তাহলিল ছাড়াও গভীর রাতে নফল নামাজ পড়তেন তিনি। নিজের জন্য তিনি করুণাময় আল্লাহ্‌র দরবারে হাত পাতেননি। পিতার উম্মতের মুক্তির জন্য সব সময় চোখের পানিতে বুক ভাসাতেন। হজরত আলী রা. বলেন– রাতের অধিকাংশ সময়ই তিনি এবাদত বন্দেগীতে কাটিয়ে দিতেন।

হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রা. বলেন– ফাতেমা এতো বেশী আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরশীল ছিলেন যে বছরের অধিকাংশ সময়ই তিনি রোজা রাখতেন। নফল এবাদত এতো বেশী আদায় করতেন যে, রাতে খুব সামান্য সময়ই নিদ্রা যেতেন।

বিশিষ্ট সাহাবী হজরত সালমন ফারসী রা. বলেন– একবার তাঁকে আমি এমন অবস্থায় দেখলাম– পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের সাথে পাখার দড়ি বেঁধে তিনি ঘুমন্ত পুত্রকে বাতাস করছেন, হাতে যাঁতা ঘুরাচ্ছেন, আর মুখে পাক কালাম মুখস্থ করছেন। এখানেই তো আল্লাহ্‌-প্রেমের সার্থকতা। ভাবে গভীরতা না থাকলে পরম প্রভুকে হৃদয় দিয়ে অনুভব করা যায় না। কঠোর সাধনার মাধ্যমে অন্তর্জগতের অমৃতলোকের সন্ধান পেয়েছিলেন তিনি। আকণ্ঠ পান করেছেন সেই অনন্তলোকের অমিয় সুধা। তাই তিনি জগত বরেণ্যা। খাতুনে জান্নাত।

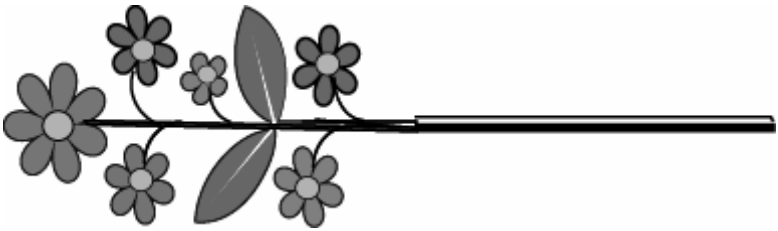

মহাবিশ্বের মহা পরাক্রমশালী সম্রাট তাঁর সৃষ্টির মধ্যে বিরাট রহস্য সন্নিবেশিত করেছেন। সে নিগূঢ় রহস্যের সম্যক উপলব্ধি ক্ষুদ্রজ্ঞানসম্পন্ন মানুষের সাধ্যাতীত। তিনি যাঁকে সাহায্য করেন সেই সাহায্য পায়। অবোধ মানুষের শিক্ষার জন্য তাঁর প্রিয়তম বান্দার মধ্যে কিছু কিছু অবিশ্বাস্য অলৌকিক শক্তি দিয়ে থাকেন আল্লাহ্পাক। নবী দুহিতা হজরত ফাতেমার মধ্যেও তেমনি কিছু অলৌকিক কার্যাবলী পরিলক্ষিত হয়েছিলো।

নবী নন্দিনীর পৃষ্ঠদেশে নূরানী নিদর্শন ছিলো। সেখান থেকে অপূর্ব উজ্জ্বল আলোর বিচ্ছুরণ ঘটতো। খাতুনে জান্নাত অত্যন্ত সতর্কতার সাথে তা মানুষের দৃষ্টির আড়ালে রাখতে সচেষ্ট থাকতেন।

একবার হজরত আলী সারাদিন ঘুরে কোথাও কোন কাজ পেলেন না। এদিকে সন্তানেরা ক্ষুধায় কাতর। অগত্যা হজরত ফাতেমা নিজ ব্যবহারের চাদরখানা বন্ধক রেখে স্বামীকে কিছু খাবার ব্যবস্থা করতে বললেন। হজরত আলী উহা এক ইহুদীর কাছে বন্ধক রেখে কিছু ময়দা নিয়ে এলেন।

নবী নন্দিনীর চাদরটি ইহুদী সযত্নে রেখে দিলেন। এক অজানা আকর্ষণে ইহুদীর স্ত্রী চাদরখানার প্রতি আকৃষ্ট হলো। রাতের আঁধারে উহা এক নূরানী আলোয় ঝলমলিয়ে উঠলো। এই ঐশ্বরিক শক্তির অলৌকিক মহিমায় তারা সবাই চমকিত হলো। এই বিস্ময়কর ঘটনা দেখে উক্ত পরিবারের সকলেই মহানবীর কাছে ইসলাম কবুল করলেন এবং সসম্মানে চাদরখানা তাঁর মালিককে ফিরিয়ে দিলেন।

উম্মে আয়মন বলেন– একদিন দেখলাম, ফাতেমার ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিলো। যাঁতা ঘোরানোর শব্দ পাচ্ছিলাম। উঁকি দিয়ে দেখলাম তিনি ঘুমুচ্ছেন। অথচ যাঁতা আপনা আপনি ঘুরছে। ঘুমন্ত হোসাইনের মাথার উপর দুলছে পাখা।

একবার ক্ষুধায় কাতর মহানবী। কিছু খাবারের প্রত্যাশায় গেলেন কন্যাগৃহে। তাঁরাও ছিলেন অনাহারী। কন্যাকে ধৈর্যাবলম্বনের উপদেশ দিয়ে পিতা ফিরে গেলেন। ফাতেমা রা. অনাহারী পিতার কথা ভেবে অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। তিনি হাত তুলে দয়ালু দাতার সাহায্য চাইলেন। কিছুক্ষণ পর অপরিচিত এক লোক

খাবার নিয়ে এলেন। সাথে সাথেই হজরত হাসানকে দিয়ে পিতাকে ডেকে পাঠালেন এবং খাবার সামনে নিয়ে জননী যেমন সন্তানের অপেক্ষায় উদগ্রীব হয়ে বসে থাকেন তেমনিভাবে বসে রইলেন হজরত ফাতেমা রা.। নবীজী এলে তাঁকে অত্যন্ত যত্নসহকারে খাওয়ালেন। স্বামী সন্তানদের খাওয়ালেন। পরিশেষে নিজেও খেলেন। অতঃপর নবীজী জিজ্ঞেস করলেন– খানা কোথায় পেলে মা! ফাতেমা বললেন– অপরিচিত এক লোক দিয়ে গেলেন। শুনে নবীজী শুধু হাসলেন।

এসব ঘটনা বাস্তবিক পক্ষে অলৌকিক। বস্তুতঃ নবী পরিবারের দৈনন্দিন জীবনে সংঘটিত সমস্ত ঘটনাই অলৌকিকত্বের মাহাত্ম্য বহন করে।

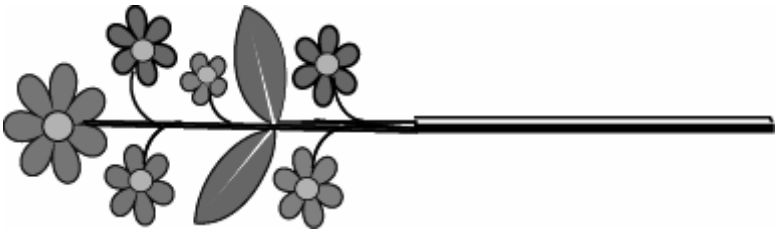

এ বিরাট বিশ্বে কিছুই স্থায়ী নয়। সব কিছুই একদিন ধূলোয় মিশে যাবে। এ সুন্দর পৃথিবীর সেরা জীব মানুষও তার জন্য নির্ধারিত সময়ের এক মুহূর্তেও বেশী অবস্থান করতে পারে না। মৃত্যুর ঊর্ধ্বে কেউ নয়। এ পরম সত্য। অভিশপ্তদের জন্য মৃত্যু কলংকিত পরিণতি বয়ে আনে। পথ প্রাপ্তদের জন্য এ এক আনন্দময় অধ্যায়। প্রিয় মিলনের সূচনাপর্ব।

এবার অনন্তলোকের ডাক এসেছে। তৈরী হচ্ছেন ফাতেমা। দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর পুনর্মিলনের প্রস্তুতির প্রয়োজন আছে বৈ কি! এ প্রস্তুতি চলছিল তাঁর পিতা বিশ্বনবী স. এর ওফাতের সময় থেকেই।

পরযাত্রার প্রাক্কালে রসুলেপাক স. প্রিয়তমা কন্যাকে ডেকে কানে কানে কিছু বললেন। ফাতেমা কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। পুনরায় কিছু বলতেই হজরত ফাতেমার মুখাবয়ব হাস্যোজ্জ্বল হয়ে উঠলো। পরবর্তীকালে হজরত আয়েশা রা. এ কান্না-হাসির রহস্য জানতে চাইলে হজরত ফাতেমা রা. বললেন– প্রথমে আব্বাজানের ওফাতের কথা শুনে আমি কেঁদেছিলাম। পরে তিনি পুনরায় বললেন– ফাতেমা, বিচলিত হয়ো না। আমার পরিবারের মধ্যে তুমিই সর্বপ্রথম আমার সাথে মিলিত হবে এবং তা হবে খুব শিগগীরই। এ কথা শুনে আমি আব্বাজানের বিয়োগব্যথা ভুলে হেসে উঠেছিলাম।

প্রকৃতপক্ষে পিতার তিরোধানের পর হজরত ফাতেমা জোহরা রা. দুনিয়াদারী পুরোপুরিভাবেই ত্যাগ করেন। শুধু স্বামী সন্তানের খেদমতটুকুই যা করতেন। শোকে-দুঃখে তাঁর শরীর ক্ষীণ-দুর্বল হয়ে পড়লো। পিতার প্রিয় সান্নিধ্যের আগ্রহে তিলে তিলে বিলিয়ে দিলেন তিনি নিজেকে। মানুষের সাথে কথাবার্তা, মেলামেশা কমিয়ে দিলেন। অধিকাংশ সময় জান্নাতুল বাকির এক নির্জন স্থানে বসে বসে তসবিহ তাহলিল করেন। দিন গোণেন প্রত্যাশিত সে শুভ সময়ের জন্য। অধিক মাত্রায় স্বামী এবং সন্তানদের সেবা-যত্ন করেন। এক অজানা আশংকায় স্বামী বিচলিত হন মনে মনে।

যতো দিন যায় হজরত ফাতেমা ততোধিক উৎফুল্ল হয়ে উঠেন। হয়তো আর সময় পাবেন না। দুনিয়ার হিসাব নিকাশ চুকিয়ে নেয়া প্রয়োজন। কথা তুললেন স্বামীর কাছে। স্বামী! আপনার কাছে অনেক ভুলত্রুটি করেছি, ঠিকমতো সেবা যত্ন করতে পারিনি। আমাকে ক্ষমা করুন। আমার ডাক এসেছে। আব্বাজানকে স্বপ্নে দেখেছি। আমার জন্য তিনি উন্মুখ হয়ে আছেন। সন্তানদের ভালোবাসবেন। আমার জন্য দোয়া করবেন। শেরে-খোদা হজরত আলী রা. ভাবতে পারেননি তাঁর প্রাণাধিকা পত্নী এত শীঘ্র সবাইকে ছেড়ে অনন্ত সুখের রাজ্যে পাড়ি জমাবেন।

রমজানের তিন তারিখ। এগার হিজরী। হজরত ফাতেমার রা. জীবনের সবচেয়ে আনন্দময় একটি দিন। একটি স্মরণীয় দিন। দীর্ঘ ছ'মাস বিচ্ছেদের অবসান হবে। এবার তিনি মিলিত হবেন রাব্বুল আলামীনের সঙ্গে এবং পরম শ্রদ্ধেয় পিতার সঙ্গে। স্রষ্টা আজ সৃষ্টিকে বরণ করে নেবার জন্য উন্মুক্ত রেখেছেন দুয়ার। দুঃখ, স্বামী ঘরে নেই। নাবালক পুত্রদের জন্য বুকের ভিতর এক অব্যক্ত ব্যথা চনমনিয়ে ওঠে। ব্যথা-আনন্দের মধ্যেই চলে তাঁর পরযাত্রার প্রস্তুতি।

শরীর মন অত্যন্ত দুর্বল। পাক বারিতালার দরবারে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না হয়ে যাওয়া চলে না। তিনি পানি তুলে কাপড় চোপড় পরিষ্কার করলেন। পুত্রদ্বয়কে গোসল করালেন এবং নিজেও অনেকক্ষণ ধরে গোসল করলেন। স্বামীর গোসলের পানি তুলে রেখে রুটি তৈরী করলেন। পুত্রদের নিজ হাতে খাওয়ালেন। স্বামীর জন্য আলাদা করে খাবার রেখে দিলেন। নিজেও সামান্য কিছু খেলেন। অতিরিক্ত কিছু খাবার পুত্রদ্বয়ের জন্য ব্যবস্থা করে রাখলেন। প্রাণাধিক পুত্রদের পরিষ্কার জামা-কাপড় পরিয়ে দু'চোখ ভরে দেখলেন। আদর করলেন। তারপর অশ্রুভারাক্রান্ত মনে বিদায় দিলেন তাঁদের পেয়ারা নানাজীর রওজা মোবারক জিয়ারতের উদ্দেশ্যে। পুত্রদের গমন পথের দিকে তাকিয়ে মনে মনে বললেন– বিদায়। আল্লাহ্ তোমাদের সহায় হোন।

সময় ঘনিয়ে আসছে। এমনিতেই অসুস্থ শরীর। গায়ে চাদর জড়িয়ে নিজের হুজরায় গিয়ে শয়ন করলেন ফাতেমা। বড় আফসোস, শেষ সময়ে স্বামীর কদমবুছি করা হলো না। দাসী উম্মে আয়মনকে ডেকে বললেন– আমার নাবালক পুত্রদের দেখাশুনার কেউ নেই। তুমি ওদের যত্ন নিও। অতঃপর নানী হজরত আসমা রা.কে ডেকে এনে অন্তিম ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন– আমার ইন্তেকালের পর অত্যন্ত পরদা সহকারে শুধু মাত্র আপনি নিজে গোসল করাবেন আমাকে। আমার স্বামী আপনাকে প্রয়োজনীয় সাহায্য করবেন। গোসলের সময় অন্য কেহ যেন উপস্থিত না থাকে এবং রাতের অন্ধকারেই যেন আমার লাশ কবরস্থ করা হয়। জানাযায় বেশী লোক যেন উপস্থিত না থাকে।

এরপর উপস্থিত সকলকে বের করে দিয়ে ঘরের দরজা ভেজিয়ে দিলেন হজরত ফাতেমা। দু'রাকাত নামাজ পড়লেন। জীবনের শেষ মোনাজাতের জন্য হাত তুললেন– আয় পরওয়ারদেগার, বিরাট বিশ্বের প্রভু, তোমার কাছে আমি নিজের জন্য কিছুই চাই না। আমার আব্বাজানের গোনাহ্গার উম্মতদেরকে তুমি ক্ষমা করো।

বাইরে উদ্বেগ আর উৎকন্ঠা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন হজরত আসমা, উম্মে সালমা, হজরত আয়েশা রা.। তাঁরা সকলেই শুনতে পেলেন বিশ্ব জননী, নবী নন্দিনী সাইয়্যেদাতুন্নিছা হজরত ফাতেমা জোহরার রা. পবিত্র কণ্ঠে সুললিত শেষ আওয়াজ আল্লাহ্র পবিত্রতম বাণী কলেমা তৈয়েবা। অতঃপর সব নীরব স্থির। বিশ্ব চরাচর যেনো সহসাই থমকে গেলো ক্ষণিকের জন্য। সবাই বুঝলেন নবী দুলালীর পবিত্র আত্মা ইহলোকে আর নেই। নেমে এলো শোকের কালো ছায়া। চারিদিকে উঠলো অনুচ্চ কান্নার রোল।

হজরত আসমা বলেন– আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় বান্দাকে কিভাবে সম্মানিত ও মহিমান্বিত করেন হজরত ফাতেমার মৃতদেহ না দেখলে বুঝতে পারতাম না। তাঁর মুখাবয়ব ছিলো নিষ্পাপ শিশুর মতো শান্ত। স্বর্গীয় আভায় উদ্ভাসিত। মুখে ছিলো চির অম্লান বেহেশতি হাসি।

হজরত ফাতেমার অন্তিম ইচ্ছা মতো তাঁর শেষ কৃত্য সমাধা হলো। হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রা. এ কাজে যোগ দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু হজরত আসমা তাঁকে বাধা দিলেন। এতে হজরত আবুবকর রা.ও বিস্মিত হলেন। অতঃপর হজরত আসমা ফাতেমার রা. শেষ অসিয়তের কথা জানালে সকলে শান্ত হলেন। আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় বান্দার ইচ্ছা পূরণ করলেন এভাবে।

অনেক বিশিষ্ট সাহাবী নবী স. এর দুলালী ফাতেমার রা. দাফন কাফনে অংশ গ্রহণে শরীক হতে না পারার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন। হজরত আলী রা. নবী নন্দিনীর অসিয়তের কথা বলে সকলকে শান্ত করেছিলেন। লজ্জাশীলতার এরূপ দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে বিরল। লজ্জাশীলতার কারণে আল্লাহ্ তাঁকে বিশেষভাবে পুরস্কৃত করবেন। শেষ বিচারের দিন হাশরের লোকদের ডেকে বলবেন– হে হাশরের লোকগণ, তোমরা চক্ষু বন্ধ করো। এখন নবী দুলালী ফাতেমা রা. পুলসেরাত পার হবেন। দুনিয়ায় অত্যন্ত লজ্জাশীলা ছিলেন বলেই আল্লাহ্ তাঁকে আখেরাতে এই সম্মানে ভূষিত করবেন। রসুলে করিম স. প্রায়ই এ কথা সাহাবীগণকে বলতেন।

মৃত্যুকালে নবী দুলালী খাতুনে জান্নাত হজরত ফাতেমা জোহরার রা. প্রিয়তম দুই পুত্র ইমাম হাসান এবং হজরত হোসাইন ব্যতীত অন্য কোনো সন্তান জীবিত ছিলেন না। মাত্র ২৯ বৎসর বয়সে তিনি পরম প্রভুর সান্নিধ্যে গমন করেন।

মদীনার ঘরে ঘরে শোকের আঁধার ঘনিয়ে এলো খাতুনে জান্নাত হজরত ফাতেমার রা. ইন্তেকালের সংবাদ পেয়ে। কেঁদে আকুল হলেন ইমাম হজরত হাসান এবং হোসাইন। ব্যথায় চৌচির হলেন শেরে খোদা, মুসলিম জাহানের চতুর্থ খলিফা হজরত আলী রা.। হজরত ফাতেমা ছিলেন ফুলের মতো। সে ফুল ঝরে গেছে, কিন্তু তার সুগন্ধি এখনো ছড়িয়ে আছে আকাশে বাতাসে সর্বত্র। চিরকাল তাঁর পবিত্র সুবাস সারা বিশ্ব-চরাচর জুড়ে চির অম্লান হয়ে থাকবে।

নবী নন্দিনী □ আবদুল ওয়াহাব খান

ISBN 984-70240-0036-1